গ্নু-লিনাক্স ইশকুল

জিএলটি মধ্যমগ্রাম
glt-mad@ilug-cal.org

ভাবা ছিল যে ফাইলসিস্টেম নিয়ে আলোচনা ছ নম্বর দিনেই শেষ হবে, কিন্তু হলনা। এখনো কিছু জিনিষ বলার আছে এই ফাইলসিস্টেম নিয়ে। ফাইলের অনুমতি মালিকানার সম্পত্তি-সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার পর আমরা যাব একটা ভৌত পার্টিশনে ফাইল সিস্টেম গড়ে ওঠার ব্যবস্থাগুলো নিয়ে। তারপর যাব ফাইলসিস্টেম নিয়ে আমাদের শেষ প্রসঙ্গ, গ্নু-লিনাক্স কাঠামোয় ফাইলসিস্টেম হায়েরার্কি স্ট্যান্ডার্ড।

।। দিন সাত।।

১।। ফাইলের সম্পত্তিসম্পর্ক

এক নম্বর দিনে যখন লিখছিলাম, তখন কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম অনভ্যস্ত একজন কাউকে আমি সুপারইউজার আর ইউজার-এর ধারণাটা কী করে বোঝাব। ওই যে ছিলনা, কারনেল স্তরে খাপ খুলতে পারে কেবল রুট বা সুপারভাইজর বা সুপারইউজার, আর ইউজার কাজ করে একদম উপরের প্রয়োগ বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়ারের স্তরে। দেখুন, সেই অবস্থাটা আমরা বেশ পেরিয়ে এসেছি, অন্তত আমার তো তাই মনে হচ্ছে। এখানে একটা বিচ্ছিরি সময়গত সমস্যা আছে, চিরকাল চিঠি লেখার সময়ে সেটা আমার মনে পড়ে যেত, একটা কিম্ভুতকিমাকার লাগত, চিঠিগুলোই কেমন গুলিয়ে যেত। সেটা লেখকের মুহূর্ত আর পাঠকের মুহূর্ত। লেখার মুহূর্ত আর পড়ার মুহূর্তের মধ্যে দিন মাস বছর আর কিলোমিটারের দূরত্ব। চিন্তার আবেগের অনুভূতির মুহূর্তের দূরত্ব। এই যে আমি লিখলাম 'বেশ', আর আপনি হয়ত যোজন যোজন দূরত্ব ঠেলে ভাবছেন, একে 'বেশ' বলে, ছ্যা। কিন্তু আমি তো আপনার মুহূর্তে বাঁচছিনা, তাই কিছু করার নেই।

এখন আমরা জানি ইউজার বলতে কী বোঝায়, যেমন এই যে সিস্টেমের উদাহরণটা আমি দিয়ে চলেছি, আমার সিস্টেমটাকে একটু বদলে নিয়ে, এখানে ব্যবহারকারী বা ইউজার হল atithi, manu, piu এবং dd। তাদের বাড়ি বা হোম ডিরেক্টরি হল যথাক্রমে /home/atithi, /home/manu, /home/piu এবং /home/dd। মিলিয়ে নিন, পাঁচ নম্বর দিনে দেওয়া /etc/passwd ফাইল থেকে। আর সুপারইউজার হল root, তার হোম ডিরেক্টরি হল /root। আগেই তো বলেছি, রুট শব্দটা দুটো অর্থেই ব্যবহার হয় গ্নু-লিনাক্সে। রুট ডিরেক্টরি মানে /, আর রুট ইউজারের হোম ডিরেক্টরি মানে /root। এবং এই সুপারইউজার হল একটা গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমে সর্বশক্তিমান, যা যা কাজ করা যায় তার প্রত্যেকটাতেই তার অপ্রতিহত অধিকার। সব কাজ সে পারেনা, যেমন একজন সুপারইউজার একটা ডিরেক্টরি ফাইলের ভিতরটা দেখতে পায়না, বলেছি আমরা, একজন সুপারইউজার আপনার সেই প্রবন্ধের কোনো প্রিন্টআউট নিতে পারেনা যা আপনি সামনের বছর লিখবেন, এই রকম।

কিন্তু সুপারইজার নয় অপ্রতিহতগতি, ইউজাররা তাই বলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে নাকি? ইউজারেরও বেশ কিছু অধিকার আছে গোটা সিস্টেমে, নইলে আপনি কাজ করবেন কী করে? কারণ, আগেই তো বললাম, সবসময়েই মেশিন ব্যবহার করবেন ইউজার হয়ে। ইউজারদের এই সাধ্য এবং অধিকারের মধ্যে আবার নানারকম প্রকারভেদ আছে, নানা গ্রুপ আছে ইউজারদের। একজন ব্যবহারকারী যতগুলো খুশি গ্রুপেরই সভ্য হতে পারে, প্রাথমিকভাবে কোনো সিস্টেমে কোনো নতুন ইউজার তৈরি হওয়ামাত্র সে অন্তত গ্রুপের একটা মেম্বার হয়ই, তার নিজের নামে যে গ্রুপের নাম, এবং একজনই সভ্য সেই গ্রুপের। এটা সচরাচর সিস্টেমের ডিফল্ট সেটিং, তারপরে যা খুশি তো বদলে নেওয়াই যায়।

৮.১।। ফাইলের মালিকানা এবং অনুমতি

যখনই কোনো ফাইল তৈরি হয় একটা সিস্টেমে, যে কোনো ফাইল, সেই ফাইলের একটা ব্যক্তি মালিক এবং একটা গ্রুপ মালিক ঘোষিত হয়ে যায়, সিস্টেম সেটা দেগে দেয় ফাইলের খুঁটিনাটিতে। যেকোনো ফাইলের উপর '`ls -al`' মেরে যেটা দেখা যায়। যেমন '/home/dd' ডিরেক্টরির ভিতর একটা সাবডিরেক্টরিতে একটা '`ls -al`' কমান্ডের ফলাফল এখানে তুলে দেওয়া যাক, '/dev' ডিরেক্টরির উপর '`ls -al`' কমান্ডের ফলাফলের একটা অংশ আগের সেকশনেই আমরা দিয়েছিলাম।

```
-rwxr-xr-x    1 dd     dd      1764506 2003-12-20 11:23 glt-les00.pdf
-rwxr-xr-x    1 dd     dd       227703 2003-12-20 11:23 glt-les01.pdf
-rwxr-xr-x    1 dd     dd       202997 2003-12-20 11:23 glt-les02.pdf
-rw-r--r--    1 root   root        294 2003-12-20 11:24 ld.so.conf
-rw-------    1 root   root        637 2003-12-20 11:24 lilo.conf
-rw-r--r--    1 root   root      13227 2003-12-20 11:24 modules.conf
```

এখানে 'ls -al' যে ছকটা ব্যবহার করেছে স্ক্রিনে তালিকা ফুটিয়ে তোলার সেটা এবার বোঝা যাক। প্রথমে তালিকার প্রথম মানে 'glt-les00.pdf' ফাইলটাকেই ধরুন। প্রথমে মালিকানা দেখানো হয়েছে '-rwxr-xr-x' অংশটায়, তারপর '1' অংশটায় দেখানো হয়েছে এর লিংক বা সংযোগের সংখ্যা কটা, তারপর 'dd' হল এর ব্যক্তি মালিক মানে ইউজার 'dd', তারপরে 'dd' মানে এর গ্রুপ মালিক মানে গ্রুপ 'dd'। এরপর এর সাইজ বাইটে, '1764506', একে মেগাবাইটে বদলে নিলে সাইজটা দাঁড়াচ্ছে ১.৬৮ এমবি। তারপর ফাইলটাকে শেষ বদলানোর তারিখ এবং সময়, '2003-12-20' এবং '11:23'। শেষে ফাইলের নাম 'glt-les00.pdf'। এর মধ্যে অন্যগুলো তো জলের মত বুঝতে পারছেন, শুধু অনুমতি আর লিংকে এখনো একটু ব্যথা আছে, সেটা সমাধান হয়ে যাবে এই সেকশনেই।

```
-rwxr-xr-x    1 dd       dd       1764506   2003-12-20   11:23   glt-les00.pdf
```

অনুমতি	লিংক	ব্যক্তিমালিক	গ্রুপমালিক	সাইজ	তারিখ	সময়	ফাইলনাম
-rwxr-xr-x	1	dd	dd	1764506	2003-12-20	11:23	glt-les00.pdf

এই অনুমতি অংশ বলতে আমরা যেটা দেখিয়েছি সেখানে ছকটা হল দশটা হাইফেনের, এইরকম '----------', এর একদম বাঁদিকেরটা হল ফাইলের চরিত্র বোঝাতে, সেটা ডিরেক্টরি হলে 'd', রেগুলার ফাইল হলে এই হাইফেনটা শূন্য থাকবে। ক্যারেকটার ডিভাইস হলে এটা হবে 'c', ব্লক ডিভাইস হলে এটা হবে 'b', লিংক হলে 'l' — এই তিনটেকে আগের সেকশনের তালিকা থেকে মিলিয়ে নিন। এবার তারপরে রইল নটা, সেটা আসলে তিনটে ড্যাশের তিনটে গ্রুপ, '--- --- ---', এখানে আসতে পারে তিনটে অক্ষর, 'r', 'w' এবং 'x'। 'r' মানে রিড বা পড়ার অনুমতি, 'w' মানে রাইট বা লেখার মানে বদলানোর অনুমতি, 'x' মানে একজিকিউট বা চালানোর অনুমতি। প্রথম তিনটে হাইফেন হল ব্যবহারকারীর নিজের, দ্বিতীয় তিনটে হাইফেন হল তার গ্রুপের, সেখানে যদি অন্য কেউ থাকে তার কী কী করার অনুমতি আছে, আর শেষ তিনটে হাইফেন হল অন্যদের জন্যে, মানে যারা ওই ব্যবহারকারী নয়, এমনকি তার গ্রুপেরও সভ্য নয়। এইখানে একটা অক্ষরও নেই, এর মানে, এটা যদি কোনো ফাইলের অনুমতি তালিকা হয় তো সেই ফাইলটা লিটারালি শিবঠাকুরের আপনদেশের ফাইল, সর্বনেশে এর আইনকানুন, ফাইলটার যে মালিক সে নিজেও ফাইলটা পড়তে বদলাতে বা চালাতে পারবেনা, শুধু ফাইলমালিকের পূর্ণ অধিকারে স্ক্রিনে ফাইলটার নাম আর অনুমতির তালিকার দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকতে পারবে, তার উপরে গ্নু-লিনাক্সে কোনো বারণ নেই। সদ্য বেরোনো কারনেল ভার্শন ২.৬ অব্দি অন্তত নেই। ওই চেয়েই থাকতে হবে তাকে, যতক্ষণ না সে 'chmod' বলে একটা কমান্ড দিয়ে ফাইলটার এইসব বেলেল্লাপনাকে শায়েস্তা করছে, সেই কথায় আসছি। তবে সেই কমান্ড না-জেনে নিজে নিজে এইরকম একটা ফাইলের মালিক হওয়ার কোনো উপায় আমি জানিনা। ফাইলের এই বিচিত্র আচরণ ঘটানো যায় একমাত্র ওই কমান্ডটা দিয়েই। আর একটা ফাইলের অনুমতি তালিকাটা যদি এই রকমের হয়, 'rwxrwxrwx', তার মানে, এই ফাইলটার উপর ব্যবহারকারীর নিজের, তার গ্রুপের এবং অন্যদের প্রত্যেকের ফাইল পড়ার, লেখার এবং চালানোর প্রতিটি অনুমতিই আছে।

এবার দেখুন তো, আপনি একটু আগের তালিকাটা থেকে, বা আগের সেকশনের তালিকাটা থেকে, এই অনুমতি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝে যাবেন, হাইফেন থাকা মানে অনুমতিটা নেই, অক্ষর থাকা মানে আছে, প্রথম তিনটে হাইফেন নিজের, পরের তিনটে গ্রুপের, শেষ তিনটে অন্যের। এবার কাজটা এখানেই শেষ নয়, গোটা সিস্টেমে যেখানে যেখানে পারেন, এই অনুমতির চক্করটা বোঝার চেষ্টা করুন। শুধু একটা কথা বলি, ডিরেক্টরির বেলায় পড়ার বা লেখার বা চালানোর অনুমতি মানেটা একটু বদলে যায়, স্বাভাবিকভাবেই, ডিরেক্টরি তো প্রোগ্রাম না, কোনো গাড়িও না যে চালালেই হল। ধরুন একটা ডিরেক্টরি a, তার মধ্যে একটা ফাইল আছে b। অন্যদের বেলায় এই a ডিরেক্টরিটা পড়ার অনুমতি নেই, কিন্তু লেখার বা এক্সিকিউট করার অনুমতি আছে। এই অবস্থায় অন্যেরা সেই ডিরেক্টরিতে ls করে b ফাইলটা যে আছে এটা দেখতে পারবেনা, কিন্তু যদি জানে যে আছে তাহলে সেই b ফাইলটা পড়তে পারবে, বা নতুন করে একটা c ফাইল লিখতেও পারবে সেই a ডিরেক্টরিতে, মজার কথা লেখার পরেও সেটা ls করে দেখতে

পারবেনা। আবার a ডিরেক্টরিতে পড়ার বা এক্সিকিউট করার অনুমতি আছে, কিন্তু লেখার অনুমতি নেই, এই অবস্থায় অন্য কেউ ডিরেক্টরিতে ls করে কী আছে দেখতে পারবে, b ফাইলটা পড়তেও পারবে, কিন্তু ওই নতুন c ফাইলটা লিখতে পারবে না ওই ডিরেক্টরিতে। আর, পড়ার বা লেখার অনুমতি আছে কিন্তু এক্সিকিউট করার অনুমতি যদি না থাকে a ডিরেক্টরিতে, তখন ls করে ফাইল দেখা, বা b ফাইল পড়া, বা c ফাইল লেখা, সবই বন্ধ।

৮.২।। ফাইলের অনুমতি বদলানো

এবার কথা হল, যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকে, দরকার মত আপনি একটা ফাইলের অনুমতি বদলাবেন কী করে। অনুমতি বদলানোর জন্যে দরকার ওই ফাইলটার উপর আপনার মালিকানা। আর সুপারইউজার বা রুট যে কোনো ফাইলের মালিকানা যে কোনো সময় বদলে দিতে পারে। এই বদলানোর দুটো প্রক্রিয়া আছে, একটা হল অক্ষর দিয়ে, অন্যটা হল সংখ্যা দিয়ে।

অক্ষর দিয়ে বদলানো মানে কোনো একটা ফাইলের মালিকের সাপেক্ষে তিন ধরনের ব্যবহারকারীর জন্যে তিনটে অক্ষর, 'u' মানে সে ইউজার নিজে, 'g' মানে তার গ্রুপের যে কোনো ব্যবহারকারী, আর 'o' মানে আদারস বা অন্য আর সবাই, আর 'a' মানে সবাই, যার মধ্যে 'u', 'g', বা 'o' সকলেই পড়ে। আর অনুমতি তো আমরা আগেই জানি — 'r' মানে রিড বা পড়ার অনুমতি, 'w' মানে রাইট বা লেখার অনুমতি, 'x' মানে একজিকিউট বা চালানোর অনুমতি। আর অনুমতি দেওয়া মানে '+', অনুমতি তুলে নেওয়া মানে '–'। এবার ধরুন, আমি essay.all.text নামের একটা প্রবন্ধ সবার পাঠে ধন্য হোক এটা আমি চাইছি, তখন আমি কমান্ড দেব 'chmod'।

কমান্ড দেব, '`chmod a+r essay.all.text`'। যদি চাই এটা হবে একটা সামাজিক নির্মাণ, স্তালিনিস্ট রকমের একটা প্রবন্ধের অ্যাসেম্বলি লাইন, সবাই লিখতে পারুক, সাম্যবাদী গনতান্ত্রিক লেখক সংঘ, কমান্ড দেব '`chmod a+w essay.all.text`'। ডিরেক্টরির বেলাতেও এই একই ভাবে কাজ করতে হবে। শুধু ডিরেক্টরির বেলায় একটা বাড়তি অপশান দেওয়া যাবে '`-R`'। এর মানে রিকার্সিভ বা পারম্পরিক। ধরুন আমি কমান্ড দিলাম '`chmod -R g+x my.directory`', এর মানে শুধু যে '`my.directory`' ডিরেক্টরিটা আমার গ্রুপের সকলের কাছে এক্সিকিউটেবল হয়ে গেল তাই নয়, এর মধ্যের যাবতীয় ফাইলরা, ছানা সাবডিরেক্টরিরা, তাদের ছানারা, বংশপরম্পরায় সকলেই এক্সিকিউটেবল হয়ে গেল আমার গ্রুপের কাছে।

এই অক্ষর দিয়ে অনুমতি বদলানোটা আমার বেশ জটিল লাগে, এত কিছু মনে রাখতে হয়। এর চেয়ে সহজ লাগে সংখ্যা দিয়ে বদলানোটা। সেখানে '4' মানে পড়া, '2' মানে লেখা, '1' মানে এক্সিকিউশন। এবার পড়া আর লেখার অনুমতি মানে '4' আর '2', মানে '6', পড়া আর চালানোর অনুমতি মানে '4' আর '1', মানে '5', লেখা আর চালানোর অনুমতি মানে '2' আর '1', মানে '3', আর সবকটার অনুমতি মানে '4' আর '2' আর '1' মানে '7'। কোনো অনুমতি নেই মানে '0'। এবার 'chmod' কমান্ডটার সঙ্গে একটা তিন অঙ্কের সংখ্যা আসতে পারে, তার প্রথমটা হল ইউজারের নিজের, পরেরটা হল তার গ্রুপের, আর শেষেরটা হল আদারস বা অন্যের। এবার ধরুন আমি সবাইকে সব অনুমতি দিতে চাইছি 'somefile' ফাইলটার উপর, তার মানে কমান্ডটা হবে, তিনটে ঘরের জন্যেই '7'। মানে, '`chmod 777 somefile`'। আমি নিজের জন্যে পড়ার লেখার আর চালানোর অনুমতি চাইছি, গ্রুপের জন্যে চালানোর আর পড়ার, অন্যের জন্যে চালানোর, তার মানে কমান্ডটা দাঁড়াবে, '`chmod 751 somefile`'। এবার করে করে দেখুন, কী হয়। যত করে দেখবেন, মাথায় বসিয়ে ফেলতে পারবেন ছকটা, তত আপনি গ্নু-লিনাক্স শেখার কাছাকাছি যাচ্ছেন।

খুব ঝঞ্ঝাটের লাগছে, না? লাগবে না, বরং কৃতজ্ঞ লাগবে, যখন মনে হবে, এটাই সেই নিরাপত্তা, যা দিয়ে আপনার গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমের ভাইরাস-অনাক্রমণীয়তাটা গড়ে উঠেছে, সেই ইমিউনিটি। নিজে ভাবার চেষ্টা করুন তো, ভাইরাস তো এক ধরনের প্রোগ্রাম, যারা সিস্টেমে ঢুকে, সিস্টেম ব্যবহারকারীদের ইচ্ছে এবং প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে সিস্টেমের ফাইল বদলাতে থাকে। এবার ভাবুন তো, কেন বলছি, যে এই মালিকানা আর অনুমতির ছকটাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ধরুন এটা এই জিএলটি ইশকুল পাঠমালার টাস্ক রইল, কোনো খুঁটিনাটি না, কিছু না, জাস্ট এই যতটুকু জানেন এর ভিত্তিতেই ভেবে ওঠার চেষ্টা করুন তো কেন এটাকেই নিরাপত্তা বলছি?

ও, একটা কথা, এই যে কোনো মালিকানা এবং অনুমতির ছকে রুট বা সুপারইউজার কিন্তু পড়েনা, তাই রুট নিজে যদি সিস্টেমের বেগড়বাই ঘটাতে চায়, সে নিজেই যদি একটা ভাইরাসকে চালু করে, রুট ইউজার বা সুপারইউজার হয়ে,

তাহলে কিন্তু সে ভাইরাস তখন ভগবান, হল বলরাম স্কন্ধে। তবে, রুট হয়ে অত ভাইরাস চালানোর পরিশ্রমের দরকার কী, সিধে তো ফাইলসিস্টেমটাই উড়িয়ে দিতে পারে সে, একদম গোড়া থেকে, আগেই বলেছি।

৮.৩।। সিস্টেম এবং ইউজার

এবার, প্রত্যেক ইউজারের আলাদা আলাদা অনুমতি এবং মালিকানার এই গোটা কাঠামোটা সিস্টেম মাথায় রাখে কী করে? — /etc ডিরেক্টরির কয়েকটা ফাইলকে দিয়ে। তার কিছুটা কিন্তু আপনি ইতিমধ্যেই জানেন, পাঁচ নম্বর দিনের আলোচনায় /etc/passwd আর /etc/shadow ফাইলদুটোর কথা মনে করুন। মনে করুন, লগ-ইন কিভাবে এদের পড়ে। গোটা সিস্টেমের মধ্যে একমাত্র এই /etc/passwd ফাইলটাতেই থাকে প্রতিটি নথীবদ্ধ ইউজারের খুঁটিনাটি। কিছু কিছু ডিস্ট্রিবিউশনে, বিশেষ করে সাম্বা বলে একটা সফটওয়ারের কার্যধারায়, এর কিছু ব্যত্যয় ঘটে, তবে তা নিয়ে এখন মাথা না-ঘামালেও চলবে। সাতটা ফিল্ডে বাঁধা এর লাইন নিয়ে আমাদের আলোচনা মনে করুন, এর মধ্যে একটা লাইন আমরা তুলে নিয়েছিলাম, '`piu:x:503:100:Smita Bhadra:/home/piu:/bin/bash`' — মনে আছে? এর মধ্যে, তৃতীয় আর চতুর্থ জায়গাটা অবস্থানটা আমরা বুঝতে পারিনি, ওই সংখ্যা দুটো, ইউজার আইডি আর গ্রুপ আইডি, ব্যক্তি-পরিচিতি আর গ্রুপ পরিচিতি। এখন বুঝতে পারছেন? এ দুটো হল দুটো সংখ্যা, যাদের দিয়ে সিস্টেম চেনে 'piu' নামক ইউজার আর তার গ্রুপকে, যাদের আমরা চিনি ইউজার 'piu' আর তার গ্রুপ 'Users'। এখানে দেখুন নম্বরদুটো আলাদা, এটা গ্নু-লিনাক্সের অভ্যস্ত জায়গা থেকে একটু আলাদা, কারণ এখানে সুজেতে 'ইউজারস' বলে এই গ্রুপটা তৈরি করে সেখানে সাধারণ ব্যবহারকারীদের রাখা হয়। বললে ও অন্যভাবে, মানে প্রত্যেকের জন্যেই একটা ব্যক্তিগত গ্রুপ তৈরি করে, রাখতেই পারে। যেমন দেখুন ওই একই ফাইলের একই লাইনে, শুধু এটা এবার স্ল্যাকওয়ার থেকে, এখানে কিন্তু নম্বর দুটো এক, দুটোই 'piu'। `piu:x:1004:1004:Smita Bhadra:/home/piu:/bin/bash` — এইখানে দেখুন ইউআইডি আর জিআইডি দুটোই এক। এবং রেডহ্যাট সিস্টেমেও, ডিফল্টে এভাবেই হয়, আলাদা করে গ্রুপ বিষয়ে কোনো অপশান না দিয়ে দিলে। সরাসরি 'useradd' বলে একটা কমান্ড দিয়ে রুট কোনো নতুন ইউজারকে নথীবদ্ধ বা রেজিস্টার করাতে পারে সিস্টেমে। এই 'useradd' কমান্ডটার ম্যানুয়াল পেজ বা ইনফো পেজ পড়ে দেখুন, /etc/passwd ফাইলের লাইনে একজন ইউজারের ওই সাতটা জায়গা বা ফিল্ডের প্রত্যেকটাকেই কিরকম আলাদা আলাদা ভাবে বদলে নেওয়া যায় রেজিস্টার করার সময়েই। তার ইউজারনেম, তার পাসওয়ার্ড, তার গ্রুপ সংক্রান্ত পছন্দ, তার পুরো নাম, তার হোম বা বাড়ি কোথায় হবে, তার শেল কী হবে। যেই রেজিস্টার্ড হয়ে গেল একজন ইউজার, তার নাম, ধাম, গোত্র, বাড়িতে পুকুর আছে কিনা, পুকুরে ঘটি ডোবে কিনা, ইত্যাদি চিত্রগুপ্ত লিখে ফেলল /etc/passwd ফাইলে, তার নাগরিকত্ব জানা হয়ে গেল সিস্টেমের, তার আগে অব্দি সিস্টেমের কাছে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। একবার রেজিস্টার করার বা নথীবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি একজন ব্যবহারকারীর খুঁটিনাটি বদলাতে চান, তার জন্যে কমান্ড আছে 'usermod'। আবার একবার বলে দেব ম্যান পেজ পড়ার কথা? এখন থেকে, যখনই কোনো নতুন কমান্ড উল্লেখ হবে, ধরেই নেবেন তার সঙ্গে এই ধ্রুবপদটা লাগানোই আছে, 'ম্যান পড়ার নেশা করো ম্যান, খেজুরগাছে হাঁড়ি বাঁধো ম্যান' (কার্টসি দোহার)।

অনেক টেক্সটেই দেখেছি, রাশি রাশি কমান্ডের ব্যবহারবিধি পরপর দিয়ে যেতে, আমিও এখানে দিতেই পারতাম, কিন্তু আমি নিজে শেখার সময়ও তো দেখছি, নিজেই তো শিখছি, এই টেক্সটটার চেয়ে এক মার্জিন এগিয়ে, নিজেরই মনে হয়, এত বোগাস আর বোরিং এইগুলো লিখে দেওয়া, রাশিরাশি গুষ্টির ওই রাশিরাশিতর পিন্ডি, ও ছাই মনেও রাখা যায়না। একমাত্র মনে থাকে ম্যানপেজ পড়ে পড়ে, করে করে, দেখে দেখে। গ্নু-লিনাক্স সিস্টেম আপনাকে যা খুশি করার মজাটা যেমন দেয়, তেমনি তার জন্যে নিজেকে বানিয়ে নেওয়া লাগে। কেন এত বারবার বিরক্তিকর রকমে এই ম্যান পড়ার কথা বলছি এটা বুঝতে পারবেন একটা গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমে নিজের মজায় কাজ করতে চাইলেই — ইট টেকস এ ওরিড ম্যান টু সিং এ ওরিড সং।

এবার আসে চিত্রদার দ্বিতীয় ফাইল, সেটাকেও চিনি আমরা, তার ছায়া-ছবি দেখেছি আমরা পাঁচ নম্বর দিনেই, /etc/shadow ফাইল। আগেই বলেছি, আগে প্রবেশ-সংকেত বা পাসওয়ার্ডটা এই /etc/passwd ফাইলটাতেই থাকত, পরে এই /etc/shadow ফাইলটা সিস্টেমে চালু হল একটা বিশেষ প্রয়োজন থেকে। /etc/passwd ফাইলটা নিয়ে সমস্যা এই যে সেটা যে কারুকেই যে কোনো সময়ে পড়তে হবে, জনপাঠযোগ্য বা ওয়ার্ল্ড-রিডেবল হতে হবে, তার

মানে এর ফাইল অনুমতির তিনটে জায়গাতেই ‘r’ দিয়ে রাখতে হবে। রুট, তার গ্রুপ, এবং অন্যরা সকলেই, প্রতিটি ইউজার প্রোগ্রামই যাতে পড়তে পারে। ইউজার প্রোগ্রামগুলো এখান থেকেই সংগ্রহ করে যে তাদের চালাচ্ছে তার সংক্রান্ত খুঁটিনাটি, যখন যখন তাদের ইউজারের পুরো নাম, তার হোম ইত্যাদি তথ্য কাজে লাগছে। একবার ‘ls -al /dev/passwd’ মেরে দেখে নিন, আপনারটায় ঠিকঠাক আছে কিনা। হল? দেখেছেন? গুড, এবার ভাবুন, যে কেউ, যে কোনো প্রোগ্রাম পুরোনো /etc/passwd ফাইলটায় এনক্রিপ্টেড চেহারায় পাসওয়ার্ডটাকে দেখতে পাচ্ছে, প্রতিটি লাইনের দ্বিতীয় ফিল্ড থেকে। তার মানে অন্য যে কেউ যে কোনো ইউজারের এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড বা ধাঁধানো প্রবেশ-সংকেতটা তুলে নিতে পারছে, এবার সম্ভাব্য প্রতিটা সমাহারকে নিয়ে ট্রাই করে যাচ্ছে। আর এক একটা বড় সিস্টেমে শ-শ ইউজার, তাদের মধ্যে এমন কেবলরাম পাবলিক দু-এক পিস থাকবেই যাদের পাসওয়ার্ড আন্দাজ করা খুব সহজ। নিজের প্রেমিকার জন্মদিন গোছের। অরিজিত বলেছিল দুটো পাসওয়ার্ড শুনে ও খুব মজা পেয়েছিল, একটা সায়মিন্দুর, ও তখন কলকাতা লাগের সার্ভারের ওয়েব-অ্যাডমিন ছিল, পাসওয়ার্ডটা ছিল ‘ami ki jani’। আর আমার সিস্টেমে রুট পাসওয়ার্ড, আগে ছিল, সেটা অবশ্য অতোটা মজার না, ‘shikarer sanket’।

কিছু পাসওয়ার্ড থাকে যারা সরাসরি ডিকশনারি শব্দের সঙ্গে মেলে, এই ধরনের পাসওয়ার্ড ভাঙার জন্যে ডিকশনারি-আক্রমণ হতে পারে, সরাসরি একটা ডিকশনারি ধরে ইংরিজির চালু আশিহাজার শব্দকে পরপর মিলিয়ে যাচ্ছে, এটার চালু নামই হল ‘ডিকশনারি অ্যাটাক’। এ ধরনের প্রোগ্রাম বানানোটাও এমন কিছু শক্ত নয়, যে নিজেই পরপর দেখে যাবে, একের পর এক। কেউ কেউ ডিকশনারি শব্দের আগে পরে একটা করে নম্বর লাগায়, সেটাও খুব সহজেই নিজের অ্যালগরিদমে নিয়ে আসতে পারে পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করার সফটওয়ারগুলো। যেটা একজনের মাথায় আসে সেটা আর এক জনের মাথায় আসবেই। যেমন দেখুন স্প্যাম মানে ভাট মেল, এমন চিঠি যা অনাকাঙ্খিত, অপ্রয়োজনীয়, মূলত বিভিন্ন পর্নো সাইটের বিজ্ঞাপন — এই স্প্যাম মেল আটকানোর জন্যে যেসব সফটওয়ার আছে, তারা মেলের সাবজেক্ট লাইনে যে শব্দগুলো আছে, মূলত যৌনশব্দ, সেগুলো থাকলেই সেই মেল আটকে দিচ্ছিল জাংক মেল ফিল্টারে, জঞ্জালচিঠির চিরুনিতে। এই স্প্যামারগুলোও তেমনি, এরা মূলত সফটওয়ার দিয়ে মেল আইডি বানায়, একের পর এক সম্ভাব্য আইডি-তে মেল ছেড়ে যেতে থাকে, আপনি সাড়া দিলেন কী মরলেন, এমনকি পাঠানোতে আপত্তি জানাতেও যদি যান তো, স্প্যামারের কাছে চলে এল যে এই আইডিটা বাস্তব। না-হলেও যে বাঁচা যায় তা নয়। এবার, যেই স্প্যাম ফিল্টারগুলো এই তরকিব কাজে লাগাল, অমনি, স্প্যামাররাও তো বসে নেই, তারা যৌনশব্দগুলোর একটা করে অক্ষর বদলে দিতে লাগলো, উচ্চারণের দিক দিয়ে কাছাকাছি বা আকৃতির দিক দিয়ে কাছাকাছি, ‘o’ বদলে ‘0’, ‘g’ বদলে ‘z’, ইত্যাদি। পাসওয়ার্ড ভাঙিয়ে তথা সিস্টেম ক্র্যাকাররা প্রায়শই বেশ বুদ্ধিমান অল্পবয়স্ক ছেলেপুলে হয়, দুনিয়াকো কুছ কর দিখানার মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যায় ভোগে, নিজের যৌন-আত্মবিশ্বাসের অভাবকে বিকিরণ করে দুনিয়াকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করার মধ্যে দিয়ে। অনেক লোকেই এদের ভুল করে হ্যাকার ডাকেন, ‘হ্যাকার’ শব্দটা গ্নু-লিনাক্স তথা ফ্রি সফটওয়ার জগতে একটা সম্মাণের শব্দ। যারা সিস্টেমকে বদলায়, ভাঙে, নতুন আকার দেয়। মূল জায়গাটা এখানে নির্মাণ। আর অন্যের ইউজার অ্যাকাউন্টে অন্যের সিস্টেমে এই বুদ্ধিমান বোকা ছেলেমানুষি নোকঝোঁক — এর নাম ক্র্যাকিং। কখনো কখনো এর মধ্যে বাবা-অবস্থানের প্রতি একটা বিরূপতাও থাকে। ব্যক্তি পারিবারিক বা সামাজিক স্তরে। ভাইরাসও বানায় এরাই, পনেরো থেকে তিরিশ বছর বয়সের, মূলত, একটু সমাজবিমুখ একটা মানসিক রোগে ভোগা পুরুষ ছেলেপুলেরা।

যাইহোক, এই ক্র্যাকারদের হাত থেকে পাসওয়ার্ডগুলোকে বাঁচাতেই মূলত, /etc/shadow ফাইলটা রাখা চালু হয়। এবং আবার মিলিয়ে দেখুন, এই ফাইলটা আর রুট ছাড়া কেউ পড়তে পারেনা, বা রুটের অধিকার সম্পন্ন সিস্টেম ছাড়া, শুধুমাত্র ওই লগ-ইন-এর সময় মিলিয়ে দেখে নেওয়া হয়। মনে আছে, আমরা বলেছিলাম, এই /etc/shadow ফাইলটা কপি করে টেক্সট ফাইল বানাতে আমার কী সমস্যা হয়েছিল? এর বাইরে এই /etc/shadow ফাইলের গঠন প্রকরণ, ফিল্ড সাজানো, যতিচিহ্ন কিন্তু একদম /etc/passwd ফাইলের মতই, পাঁচ নম্বর দিন থেকে মিলিয়ে নিন। এখানে আটটা কোলোন ‘:’ দিয়ে আলাদা করা নটা ফিল্ড বা অবস্থান আছে, তার খুঁটিনাটি অর্থগুলো ‘man -5 shadow’ করে দেখে নিন কনফিগারেশন ফাইলগুলোর বিবরণ থাকে ম্যানুয়ালের পাঁচ নম্বর সেকশনে।

৮.৪ ।। /etc ডিরেক্টরির আরো দুচারটে ফাইল

/etc/passwd এবং /etc/shadow এই দুটো ফাইলের সঙ্গে আসে আরো দুচারটে ফাইল, এই /etc ডিরেক্টরিতেই, যারা অপারেটিং সিস্টেমের অনুমতি এবং কাঠামোর মালিকানাটা ধরে রাখার কাজে /etc/passwd এবং /etc/shadow ফাইলদুটোকে সহায়তা করে। যেমন, একটা হল /etc/group, এর কাজ ওই গ্রুপের কাঠামোটাকে নিয়ন্ত্রণ করা। বড় বড় সিস্টেমে তো এটা বেজায় কাজে লাগে, ছোট ব্যক্তিগত পিসি সিস্টেমে, যেখানে একাধিক ইউজার আছে, মাঝে মাঝে নিজের রেলাবাজি দেখাতে কাজে আসে, কখনো কখনো সত্যিই নিরাপত্তার জন্যে দরকার পড়ে। এই /etc/group ফাইলে থাকে গ্রুপের বিবরণ। ধরুন আপনার মেশিনে একটা সিডি-বার্নার আছে, এবং আপনি চাননা যে যে কেউ সেটায় সিডি পোড়াক, তখন আপনি 'burner' নামে একটা গ্রুপ তৈরি করতে পারেন, তার কমান্ডটা 'groupadd', ওই 'useradd' কমান্ডের মতই। কমান্ড দিন — '`groupadd burner`'। তবে, মনে রাখুন, ওই 'burner' নামের একটা ইউজার থাকতে হবে, না-থাকলে বানিয়ে নিতে হবে। এবং বিশেষ কিছু ফাইল বা ডিরেক্টরির মালিকানা দিয়ে দিতে পারেন এই গ্রুপকে। যেমন এই সিডি-বার্নারের বেলায় এই ডিভাইস ফাইলটার মালিকানা আপনি দিয়ে দেবেন এই গ্রুপকে, 'chown' কমান্ড দিয়ে। এবং এর পরে, আপনি যাকে যাকে এই গ্রুপে আনতে চান তাদের নাম ঢুকিয়ে দিতে পারেন এই গ্রুপের সঙ্গে ফাইলে। গ্রুপ সংক্রান্ত গোটা খুঁটিনাটি, কী কী গ্রুপ, কোন কোন ইউজার কোন কোন গ্রুপের মেম্বার — এই গোটাটাই লিপিবদ্ধ থাকে /etc/group ফাইলে। আগেই তো বলেছি, একটা গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমে সবকিছু, সমস্ত কিছুকে নিজের মত করে বদলে নেওয়া যায় এই ফাইলগুলোকে বদলে। তবে বড় সিস্টেমে এত এত বেশি ইউজার এবং এত এত গ্রুপ থাকতে পারে যাদের এভাবে বদলানো খুব জটিল হয়ে পড়ে। তার জন্যে একটা কমান্ড আছে, 'groupmod', আবার ঠিক 'usermod' কমান্ডের মতই। কোনো একটা ইউজারকে কান ধরে নিজের সিস্টেম থেকে তুলে বাইরে ফেলে দেওয়ার জন্যে যেমন আছে 'userdel', গ্রুপের জন্যে আছে 'groupdel'। এবার ধরুন, আপনি আপনার প্রবন্ধের সংখ্যা এবং পরিমাণে যেমন সৃষ্টিশীল ছিলেন (না না, গুণের কথা বলছি না, প্রবন্ধের গুণগত মান আমি নিজের প্রবন্ধ ছাড়া আর দেখেছি কোথায়? ভাসই তো বোধহয়, যেমন নিজেই লিখেছিলেন, বিপুলা এই ধরিত্রী, কালও নিরবধি, বলা যায়না, ভাসের মত লেখক আবারো তো জন্মাতে পারে কোথাও। এব্যাপারে বস লেখক হলেন নিটশে, তার এক্সে হোমোর একটা চ্যাপ্টারের নাম, হোয়াই আই রাইট সাচ এক্সেলেন্ট বুকস।) ধরুন সেরকমই সৃষ্টিপরায়ন হলেন আপনার গ্রুপ এবং ইউজারদের নিয়ে, গোটাটাই ঘেঁটে ফেলেছেন, এবার আপনার সেই গ্রুপিণ্ডটা পাবেন কোথায়? ওই /etc/group ফাইলটা তো আছেই, কিন্তু বড় ফাইল হলে তার মধ্যে খুঁজে খুঁজে বার করা কোন কোন ইউজার কোন কোন গ্রুপের মেম্বার — সে প্রায় অসম্ভব। তার জন্যে একটা কমান্ড আছে 'groups'। . . . *খেজুরগাছে হাঁড়ি বাঁধো ম্যান . . .*

/etc ডিরেক্টরিতে শুধু /etc/passwd, /etc/shadow, আর /etc/group এই কনফিগারেশন ফাইলগুলোই নয় একটা আস্ত ডিরেক্টরি থাকে এই ইউজারের খুঁটিনাটির কাজে, তার নাম '/etc/skel'। এই স্কেলিটন বা কংকালটা একটা টেমপ্লেট, একটা ছক, একটা ছাঁচ। এই টেমপ্লেট ধারণাটা গোটা কম্পিউটার মননেই বারবার আসে, অনেকটা সময় ধরে ভাবলাম একটা জবর প্রতিতুলনার জন্যে, তেমন কিছু মাথায় এলনা। সবচেয়ে কাছাকাছি আসছে যেটা সেটা এরকম। ধরুন একটা মেয়ে, তার একটা টেমপ্লেটের নাম কনে। তখন তার পরনে লাল বেনারসি, কপালে চন্দন, গায়ে গয়না, হাতে কাজললতা, ইত্যাদি। এবং এই টেমপ্লেটটা মুহূর্তিক বা ইনস্ট্যানটেনিয়াসও নয়। কারণ কনে সাজার একটা দীর্ঘ শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া আছে, গায়ে হলুদ, চুলে হেনা, ঠোঁটে তাম্বুল-না-হলেও-রেভলন, ইত্যাদি। মানে এই টেমপ্লেটে ঢুকবে একটা মেয়ে, বেরোবে কনে হয়ে। আবার ওই মেয়েকে যখন রাঁধুনি টেমপ্লেটে দেখছি, তখন তার পরনে ছাপাশাড়ি গাছকোমর করা, চুল উড়োঝুরো, গালে একটু ময়দা, নাকে ঘাম, আঙুলে হলুদ, হাতে খুন্তি, ইত্যাদি। এখানেও একটা প্রক্রিয়া আছে, সে এসেছে তরকারি কোটা, মাছে হলুদ-নুন মাখানো, ময়দা মাখা ইত্যাদি উপাদানে তৈরি একটা টেমপ্লেটের ভিতর দিয়ে — ওই একই মেয়ে এখন রাঁধুনি। /etc/skel ডিরেক্টরিতে থাকে ঠিক এইরকম একটা টেমপ্লেট, একজন ইউজারের হোম ডিরেক্টরির। যেখানের প্রতিটি কনফিগারেশন ফাইলকে কপি করে দেওয়া একজন নতুন ইউজার যোগ করার সময় তার ইউজার ডিরেক্টরিতে। এই ফাইলগুলোর মধ্যেই দেওয়া থাকে বিভিন্ন সময়ে সিস্টেমের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে, তার লগ-ইনের পরপরই সিস্টেম কী করবে, তার কমান্ড প্রম্পট কী হবে, তার কিছু জরুরি ইউজার প্রোগ্রাম চালানোর সময়ে সিস্টেম কোন কোন ডিরেক্টরির কোন কোন ফাইল খুলবে,

তার এক্স উইনডোজ চালানোর খুঁটিনাটি, ওই ইউজারের এনভায়র্নমেন্ট ভ্যারিয়েবলগুলো কী হবে, ইত্যাদি। এই এনভায়র্নমেন্ট ভ্যারিয়েবলগুলোর কথায় আমরা পরে আসব।

৯।। লিংক

ছ নম্বর দিনের সেকশন ৭-এর ডিভাইস ফাইলগুলোকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে আমরা গিয়েছিলাম ফাইলের মালিকানা এবং অধিকারের আলোচনায়। সেটার প্রাথমিক একটা ধারণা আমাদের হয়েছে, এখনো ওই ডিভাইস ফাইলগুলোকে বোঝার একটা সমস্যা রয়ে গেছে, তার নাম লিংক, দেখুন যে ফাইলগুলোর লং বা দীর্ঘ লিস্টিং শুরু হয়েছে 'l' দিয়ে, যেমন ব্লক ডিভাইসের 'b', ক্যারেকটার ডিভাইসের 'c', ডিরেক্টরির 'd' এবং রেগুলার বা সাধারণ ফাইলের বেলায় নিছক '–'। এই লিংক ব্যাপারটাকে একটু বুঝে নেওয়া যাক। প্রায়ই একটা ফাইলের একই সঙ্গে দুজায়গায় বা দুইয়ের বেশি জায়গায় থাকার দরকার পড়ে। নানা ধরনের প্রোগ্রাম নানা কাজে নানা জায়গায় তাদের ফাইল খোঁজে। এবার কোনো একটা বিশেষ ফাইল যদি এরকম একাধিক প্রোগ্রামের সঙ্গে অন্বিত হয় তাহলে তার একই সঙ্গে অনেক উপস্থিতির দরকার পড়ে। এর মধ্যে অনেকসবয় কিছু ঐতিহাসিক কারণও থাকে, আগে একসময় প্রথা ছিল একটা বিশেষ ফাইলের একটা বিশেষ জায়গায় থাকা, পরে কাজের সুবিধের জন্যে জায়গাটা বদলানো হয়েছে, এবার পুরোনো সময়ের প্রথায় তৈরি প্রোগ্রামগুলো সেই ফাইলটাকে পাবে কী করে? একই সঙ্গে কেউ একের বেশি জায়গায় থাকতে পারেনা। তাই, একটা জায়গায় সত্যিই নিজেকে রেখে, অন্য জায়গাটায় বা জায়গাগুলোয় নিজের বদলে নিজের একটা কান রেখে আসার দরকার পড়ে, পরে কান টানলেই যাতে মাথা আসতে পারে। এইসব কানবাজি না করে সরাসরি আর এক জায়গায় ফাইলটা কপি করে দেওয়ার সমস্যা এই যে কপি করা মাত্রই কপিটা তো নিজেই একটা স্বতন্ত্র ফাইল হয়ে গেল, নিজের অস্তিত্ব এবং ইতিহাস। তার মানে সিস্টেমের হিশেব রাখতে হবে দুটোর মিলের, একটা বদলালেই অন্যটায় তার অনুরূপ বদল ঘটাতে হবে। সিস্টেমের উপর আর কত অত্যাচার করা হবে? আর সিস্টেম যে চালায়, মানে সেই অ্যাডমিন্স্ট্রেটর বা সুপারভাইজর বা সুপারইউজার, তাদের অবস্থাটা ভাবুন। এবার একটা ফাইলকে ভাবুন যা একই সঙ্গে অনেক ডিরেক্টরিতে আছে, কিন্তু একটা জায়গায় তার ভিতরকার তথ্য বদলালেই অন্য জায়গাগুলোয় বদলে যায়। মানে এক কথায় এটা যেন একাধিক ফাইল, যাদের দুজনেরই তথ্যের ভাণ্ডারটা এক। এই কাজটাই করে লিংক, এই রকম একই তথ্যের একাধিক ফাইল বানানোর সুযোগ দেয়।

কাজটা করে দেখা যাক। আমরা একাধিকবার 'cat' বা কনক্যাটেনেট, মানে যোগ করা বা সাজানো, কমান্ডটাকে ব্যবহার করেছি কিছুটা পরিমাণ টেক্সটকে পেতে দেওয়ার কাজে। কখনো পেতে দিয়েছে স্ক্রিনে, আমরা কনসোলে ফাইলটা পড়েছি। যেমন 'cat lilo.conf' বলে আমরা 'lilo.conf' ফাইলটাকে স্ক্রিনে পেতে নিয়ে পড়েছি। বা 'cat lilo.conf>lilo.text' বলে আমরা সেই 'lilo.conf' ফাইলের টেক্সটাকে পেতে দিয়েছি 'lilo.text' ফাইলে। এবার ফাইল থেকে স্ক্রিনে পেতে দেওয়ার ঠিক উল্টো প্রক্রিয়ায় স্ক্রিনে লেখা আমাদের টেক্সটকে ফাইলে পেতে দিতে দেখব আমরা 'cat' কমান্ডটাকে। ছোটখাটো দু-চার লাইনের ফাইল লিখবার জন্যে এটা একটা ভালো উপায়।

'cat > onefile' কমান্ড লিখে এন্টার মারার পর, কমান্ড প্রম্পট আর ফেরত আসবে না। কমান্ড প্রম্পট ফেরত না-আসার মানে কী সেটা মনে করুন পাঁচ নম্বর দিন থেকে। তার মানে সিস্টেম আপনার কাজে নিয়োজিত, কাজটা চলছে, এখনো সমাপ্ত হয়নি, সমাপ্ত হলেই কমান্ড প্রম্পটটা ফেরত আসত। এবার ঠিক টাইপ করার লাইনের নিচেই কালো স্ক্রিনে আপনি যা টাইপ করবেন সেটা ওই 'onefile' ফাইলে যোগ হয়ে চলেছে। আপনি একটা লাইন লিখে এন্টার মারলে সেই নিউলাইন-চিহ্নটাও ঢুকে যাচ্ছে ওই ফাইলে, পরে সে ওই ভাবে লাইন ভেঙেই দেখাবে। এই টাইপ করা টেক্সটকে ফাইলে তোলার প্রক্রিয়াটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না আপনি 'কন্ট্রোল-ডি', <Ctrl-D>, মারছেন, মানে 'কন্ট্রোল' সুইচটা টিপে রেখে 'ডি' সুইচটা টিপছেন। এবার 'কন্ট্রোল-ডি' মেরে বেরিয়ে এসে আপনি 'ls' মারলেই আপনি দেখতে পাবেন 'onefile' ফাইলটাকে। এবার কমান্ড দিন 'cat onefile', দেখুন স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে হুবহু যা আপনি টাইপ করেছিলেন। প্রথম 'cat' আপনার টাইপটাকে রিডাইরেক্ট করে পৌছে দিল স্ক্রিন থেকে 'onefile' ফাইলে, দ্বিতীয়বার 'onefile' ফাইল থেকে স্ক্রিনে। এই 'cat' কমান্ড দিয়েই আবার টেক্সটের সঙ্গে নতুন টেক্সট যোগও করা যায়। আগের বারের 'cat > onefile' কমান্ডটার জায়গায় এবার নতুন কমান্ড দিন

“`cat >> onefile`”। আবার টাইপ করে যান। একই ভাবে ‘কন্ট্রোল-ডি’ মেরে বেরিয়ে আসুন। আবার করুন ‘`cat onefile`’, এবার দেখুন, আগের টেক্সট-এর সঙ্গে পরেরটুকু যোগ হয়ে গেছে। এর নাম অ্যাপেন্ড করা। এর চিহ্ন হল ‘`>>`’, যেরকম চালান করার বা রিডাইরেক্ট করার চিহ্ন হল ‘`>`’। শুধু স্ক্রিন থেকে রিডাইরেক্ট করে অ্যাপেন্ড করা নয়, সরাসরি একটা ফাইলকেও অ্যাপেন্ড করা যায়। এইমাত্র বলা প্রক্রিয়ায় আর ‘`cat > twofile`’ কমান্ড লিখে একটা ফাইল লিখুন ‘twofile’। ফাইল বানানো শেষ হওয়ার পরে, কমান্ড দিন ‘`cat twofile >> onefile`’। তারপর গোটাটাকে স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কমান্ড দিন ‘`cat onefile`’। দেখুন, ‘twofile’ ফাইলের টেক্সট যোগ হয়ে গেছে ‘onefile’ ফাইলের মধ্যেই, পুরোনো টেক্সট-এর পরে। ‘touch’ দিয়ে আমরা যেমন ফাঁপা ফাইল বানানোর কায়দা শিখেছিলাম, তেমনি গ্নু-লিনাক্সে টেক্সট ফাইল বানানোর সহজতম কায়দাটা আমরা এইমাত্র শিখলাম। এবার এটাকেই আমরা ব্যবহার করব লিংক বোঝার কাজে।

৯.১।। সিম্বলিক বা সফট লিংক

প্রথমে টাচ করুন ‘onefile’ নামের একটা ফাঁপা ফাইলকে। কমান্ড দিন ‘`touch onefile`’। এবার কিছু আলাদা করে না বুঝেই পরের কমান্ডটা দিন, পরে আমরা এর মানেটা বুঝব — ‘`ln -s onefile twofile`’। কমান্ড প্রম্পট তো ফেরত এলো তার কাজ শেষ করে, কিন্তু এই কমান্ডে কাজটা কী হল সেটা বুঝতে হবে তো, ডিরেক্টরির হালহদিশ বোঝার জন্যে আমাদের কমান্ড তো আছেই, ‘`ls -al`’। স্ক্রিনে দেখুন, পরিষ্কার দুটো ফাইলকে দেখাচ্ছে। তার মানে আমাদের ওই না বোঝা কমান্ডটা আমাদের টাচ করা ‘onefile’ ফাইলটা ছাড়াও একটা নতুন ফাইল তৈরি করেছে ‘twofile’ নামে, এবং এদের দুজনের বাইট সাইজটা দেখুন তো? চমকালেন? এর মানে কী? ‘onefile’ দেখাচ্ছে শূন্য, অথচ ‘twofile’ দেখাচ্ছে সাত? ‘onefile’ শূন্য এর মানেটা তো বুঝতে পারছি, আমরা কিছুই রাখিনি সেখানে, শূন্য ফাঁপা শুধু নামসর্বস্ব, যাকে জরুরি অবস্থার পরের ফেজে আমরা ডাকতাম সিদ্ধার্থ, চায়ের দোকানে গিয়ে বলতাম, মেনোদা দুটো চা, একটা সিদ্ধার্থ, মানে দুটোকে তিনটে করো। মধ্যে এতগুলো বছরে কিশোর সিদ্ধার্থ বড় হয়েছে, এখন বোধহয় বলা যায়, দুটো চা, একটা বুদ্ধদেব। কিন্তু ফাইল সাত দেখাচ্ছে কেন? ফিরে আসব এটায়, মাথায় রাখুন।

এবার, আমরা জানি ‘cat’ দিয়ে কী করে ফাইলে টেক্সট ভরতে হয়, ভরুন আপনার মনোমত টেক্সট, যা খুশি, কিন্তু সাবধান, গ্নু-লিনাক্স বিষয়ে কোনো খারাপ কথা লিখবেন না, এটা গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে আপনি যদি প্রকৃত বিশ্বাস থেকে কোনো খারাপ কথা সিস্টেমের বিষয়ে লেখেন আপনার স্ক্রিনে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনিটরটা সাউন্ডবক্স হয়ে যাবে আর মড়াকান্না কাঁদতে থাকবে, হার্ডডিস্ক পুরো ফরম্যাট করে ফেলার আগে অব্দি। টেক্সট ভরার পর ‘কন্ট্রোল-ডি’ মেরে বেরিয়ে আসুন। আমরা জানি, এখন স্ক্রিনে ‘`cat onefile`’ কমান্ড দিয়ে আমরা এইমাত্র টাইপ করা গোটা টেক্সটটা দেখতে পাব। কিন্তু, একই কাজ কবার করতে ভালো লাগে মানুষের? কমান্ড দিন, ‘`cat twofile`’, দেখুন তো কী ঘটেছে? স্ক্রিনে আপনি দেখছেন হুবহু ‘onefile’ ফাইলে ঢোকানো টেক্সটটা। হ্যাঁ, ঠিক এটাই ঘটার কথা ছিল। দুটো আলাদা ফাইল, তাতে তথ্য একই। ঠিক এটাই করে আমাদের ওই নতুন কমান্ড ‘`ln -s`’। আসলে ‘`ln`’ হল কমান্ড, আর ‘`-s`’ তার অপশান। ‘`ln`’ কমান্ডটা একটা ফাইলের লিংক তৈরি করে, মানে, অন্য এমন একটা ফাইল তৈরি করে যা প্রথম ফাইলের তথ্যটাই বহন করে, তাতে কোনো বদল এলে লিংক ফাইলটাও বদলে যায়। এবং একবার ‘`ls -al`’ মেরে দেখুন তো, দীর্ঘ তালিকায়, আমরা যেমন দেখলাম, একদম বাঁদিকের জায়গাটায়, এক একটা অক্ষরের এক একটা মানে, এই দুটো ফাইলের, ‘onefile’ আর ‘twofile’, অক্ষরদুটো আলাদা কী কী? কী দেখছেন? যখন ‘onefile’, তখন ‘`-`’, আর যখন ‘twofile’, তখন ‘`l`’। এর মানেটা কী — মনে করুন। তিন প্যারা আগেই আছে। মানে, ‘twofile’ হল একটা লিংক, সিম্বলিক লিংক, যার নিজের শরীরে আসলে কিছুই নেই, শুধু একটা দিকচিহ্ন, দেখিয়ে দেওয়া সেই ফাইলটাকে যার সে লিংক। যখন আমরা এই সিম্বলিক লিংক ফাইলকে ক্যাট করছি, ডগ করছি, যা-খুশি করছি, তখন আসলে তাকে কিছুই করছি-না, তার শরীরে পাওয়া লিংক বেয়ে সিস্টেম পৌছে যাচ্ছে যার লিংক সে সেই আসল ফাইলে। যা যা আমরা ঘটাচ্ছি, সবই ঘটছে ওই মূল ফাইলে। লিংক ফাইলের নিজের বলে কিছু নেই শুধু ওই মূল ফাইলটাকে দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া, তোমারি গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে।

'`ls -al`' কমান্ডের কাজ আমাদের এখনো ফুরিয়ে যায়নি, এবার এই দুটোর বাইটসাইজ দেখুন তো? 'onefile' কত তা আমি বলতে পারব না, যতটা আপনি লিখেছেন। কিন্তু 'twofile' কত তা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি — সাত। কী করে? এবার আর একটা ফাঁপা ফাইল বানান, আপনার কাছে কোনো ব্যাপার না, আপনি তো টাচউড হয়ে গেছেন, ছুঁলেই ফাইল। শুধু এবার তার নাম দিন 'threefile', এবার তাকে '`ln -s`' করে আর একটা ফাইল বানান, তার নাম দিন 'fourfile'। আবার যদি '`ls -al`' করেন, এবার 'threefile' যথারীতি পাচ্ছেন শূন্য, 'fourfile' কিন্তু বাইটসাইজ পাচ্ছেন নয়, আগেরবারের মত সাত না। এবার 'threefile' ফাইলে টেক্সট ভরুন, যত ভরবেন সেই অনুযায়ী তার বাইটসাইজ বাড়বে, কিন্তু 'fourfile' সেই দশের থেকে এক কম থেকে যাবে চিরকাল। এই সাইজটা আমি বলছি কী করে? বুঝতে পারছেন? না-পারলে শূন্য নম্বর দিনের একদম শেষ দিকের টেক্সট-তথ্যের সাইজের জায়গাটা আর একবার পড়ে আসুন, তাতেও যদি আপনার মাথায় না-এসে তার মানে এত সময় ধরে বোকার মত পড়ে পড়ে আপনার বেসাল মেটাবলিক রেট কমে গেছে। তারস্বরে, সাবধান যদি রাত্তির হয়, হেডফোন লাগিয়ে, একটু সুখবিন্দার সিং বা জসপিন্দার নরুলা শুনুন। আচ্ছা, আপনাকে একটু হেল্প করে যাই, দেখুন তাতে পারেন কিনা — এবারে আরো দুটো ফাইল বানান, ওই একই ভাবে, প্রথমে টাচ, তারপর লিংক। এবারে নাম দিন 'fivefile' আর 'sixfile'। এবারেও, 'fivefile' অবভিয়াসলি পাবেন শূন্য, কিন্তু 'sixfile' পাবেন আট।

শুধু ফাইলই না কিন্তু, এই সিম্বলিক লিংক তৈরি করা যায় একটা ডিরেক্টরিরও। তখন ওই সিম্বলিক বা প্রতীকী লিংকের উপর আমাদের যে কোনো কাজ আসলে ঘটবে সেই ডিরেক্টরির উপর, যার সে লিংক। ধরুন আপনার ডিরেক্টরি 'onedir', এর একটা সিম্বলিক বানালেন 'twodir'। এবার এই 'onedir', মূল ডিরেক্টরির মধ্যে একটা ফাইল বানান, আপনি বানাতে জানেন, ফাঁপা ফাইল মানে 'touch', আর দোকানে কোনো মাল রাখতে চাইলে 'cat'। এবার '`ls -al twodir`' করে দেখুন আপনার এইমাত্র বানানো ফাইলের খুঁটিনাটি অবিকল দেখিয়ে দিচ্ছে, যা আপনি বানিয়েছিলেন 'onedir' ডিরেক্টরিতে। আমাদের কাছে 'twodir' আসছে মূল 'onedir' ডিরেক্টরির একটা হুবহু প্রতিলিপি হয়ে, কিন্তু এটা কোনো প্রতিলিপি না, আমরা আসলে 'onedir' ডিরেক্টরিকেই দেখছি, শুধু অন্য নামে।

এই নানা নামে ডাকা গোলাপের গল্প নিছক ফুল ভালোবাসা নয়, এর নানা জরুরি ব্যবহার আছে। দু-একটা আমরা দেখব। অন্যগুলো দেখতে থাকবেন, সিস্টেমে কাজ করতে করতে। যেমন ধরুন, আপনার দুটো সিডি-ড্রাইভ আছে, একটা বার্নার, আর একটা নিছক রিডার। আপনি বার্নারটাকে শুধু সিডি পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করতে চান, আর এমনি রিডারটাতেই ভিউসিডি অডিয়োসিডি ইত্যাদি চালাতে চান। দুটো সিডিড্রাইভ, সেটা যদি স্কাসি হয় তাহলে, ছ নম্বর দিনে দেখেছি আমরা, তার নাম '/dev/scd0' আর '/dev/scd1'। আবার যদি তারা আইডিই ড্রাইভ হয়, তাকে পাব '/dev/sr0' আর '/dev/sr1' ফাইলে। সচরাচর এর প্রথমটাই হয় বার্নার ড্রাইভ, কারণ, মাদারবোর্ডের মাস্টার সংযোগে বার্নার আর স্লেভ সংযোগে রিডার না-লাগালে কিছু অসুবিধা হতে পারে, তার মানে '/dev/scd1' বা '/dev/sr1' হল সেই ড্রাইভ যেখান থেকে আপনি ভিউসিডি বা অডিয়োসিডি চালাতে চান। এবার ধরুন, আপনি এমপ্লেয়ার বা যেকোনো ইউজার প্রোগ্রাম চালাচ্ছেন, যার ডিফল্ট সেটিং করা আছে — তুমি সিনেমার ভিউসিডি খোঁজো '/dev/cdrom' ফাইলে, সেখানে যা পাবে তাকে চালাও। কোনো অসুবিধে নেই, আপনি একটা সিম্বলিক লিংক বানিয়ে দিন, কমান্ড দিন 'ln -s /dev/scd1 /dev/cdrom' বা, 'ln -s /dev/sr1 /dev/cdrom', মানে আপনারটায় যা, সেই অনুযায়ী। প্রথম প্রথম যখন ডিভাইস ফাইল দিয়ে এটা বুঝতে অসুবিধে হয়, বা সিস্টেমের সঙ্গে আপনার পরিচিতি যথেষ্ট নয়, তখন একটা সরল উপায় হল 'eject /dev/scd1' বা 'eject /dev/sr1' মারা — একটা একটা করে ডিভাইস ফাইল দিয়ে দেখুন, কোনটায় আপনার আজি সিডিরো দুয়ার খোলা হচ্ছে, সেটাই আপনার ডিভাইস ফাইল। ব্যাস, যেই সিম্বলিক লিংকটা তৈরি হল, কাজ খতম, এখন থেকে সিস্টেম নিজেই যখন '/dev/cdrom' খুঁজবে, আসলে পাবে '/dev/scd1' বা '/dev/sr1' ডিভাইস ফাইলকে। এবার ছ নম্বর দিনের তুলে দেওয়া পনেরোটা ডিভাইস ফাইলের দীর্ঘ তালিকা বা লং লিস্টিং থেকে দেখুন তো এই কায়দাটা আপনি বুঝতে পারছেন কিনা, তখন যেটা আমরা ছেড়ে এসেছিলাম? লিংক ফাইলের মানে বুঝতে পারছেন? পরে দেখবেন, যখন আমরা মাউন্ট ব্যাপারটা ভালো করে বুঝব, মাউন্টের ব্যাপারেও খুব কাজে লাগে সিম্বলিক লিংক। এবং সিস্টেমে গোড়া থেকেই কোথায় কোথায় কোন ফাইলের বা ডিরেক্টরির সিম্বলিক লিংক থাকবে তার ছকটা করা থাকে গ্নু-লিনাক্সে ফাইলসিস্টেম হায়েরার্কি স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যেই।

৯.২।। সফট লিংক আর হার্ড লিংক

গ্নু-লিনাক্সে একই ফাইল একটা ফাইলসিস্টেমের একাধিক জায়গায় একাধিক নামে থাকতে পারে, যেখানে তথ্যের ভাণ্ডারটা একই শুধু নানা নাম তাদের, একে বলে হার্ড লিংক। সিম্বলিক লিংকের সঙ্গে এর মিল আছে, কিন্তু পার্থক্যও আছে। দুই রকম লিংক-কে একসঙ্গে পেড়ে ফেলা যাক। শুধু, সরি, এটার জন্যে একটু হুবহু টাইপ করতে হবে, যারা টাইপ করতে খুব একটা অভ্যস্ত না, তাদের টাইপ করার সময় একটা কেলো হয় এই যে, বর্ণমালাগুলো ঠিকঠাক আসে, কিন্তু যতিচিহ্ন আর স্পেসগুলো ঠিকঠাক খেয়াল থাকেনা। এখানে একটা বাড়তি যতিচিহ্নও খেয়াল রাখবেন, নিউলাইন মানে নতুন-লাইন, সচরাচর টেক্সট-এর ভিতর আমরা এন্টার বা ক্যারেজ-রিটার্ন মেরে যা করি — যেখানে লাইন শেষ করে এটা মারতে হবে সেখানে আমি বলে দেব।

প্রথমে টাচ করে 'onefile' বানান, '`touch onefile`'। এবার দুরকমের দুটো লিংক বানান, প্রথমটা সিম্বলিক বা সফট লিংক 'twofile', কমান্ডটা তো ইতিমধ্যেই জানেন, '`ln -s onefile twofile`'। এবার দ্বিতীয় একটা লিংক বানান, 'threefile', এটা কিন্তু হার্ড লিংক, এবারে কমান্ড দিন '`ln onefile threefile`'। এবার একবার '`ls -ail`' মারুন, খেয়াল করুন, এই অপশানটা '`-ail`' কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত অপশান '`-al`' থেকে আলাদা, মধ্যের বাড়তি '`i`' অপশানটা কী দেখাচ্ছে সেটা আমরা এখুনি দেখতে পাব। যে তালিকাটা ফুটে উঠবে সেটা এইরকম, শুধু বোঝার সুবিধের জন্যে পরের দুটো লাইন আগে পরে করে দিয়েছি, নামের বর্ণমালা অনুযায়ী এলএস তো থ্রিফাইলকে টুফাইলের আগে এনেছিল।

```
12623010 -rw-r--r-- 2 dd users 0 2003-12-24 10:49 onefile
12623012 lrwxrwxrwx 1 dd users 7 2003-12-24 10:50 twofile -> onefile
12623010 -rw-r--r-- 2 dd users 0 2003-12-24 10:49 threefile
```

এরমধ্যে একদম বাঁদিকের ওই বাড়তি গাবদা নম্বরটা ওই '`i`' অপশানের অবদান। আইনোড নম্বর। আসছি আমরা সেই কথায়। এখানে দেখুন, সফট লিংক বা 'twofile'-এর গল্পটা আমাদের চেনা, ঠিক এরকমই এসেছিল আগে, বাইটসাইজ সাত, আর বাঁদিকে লেখা '`l`' কিন্তু, হার্ড লিংক বা 'threefile' দেখুন, কিছু মেলাতে পারছেন? সবকিছুই 'onefile'-এর মত, যেন নিজেই একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন ফাইল, শুধু একটা জায়গা বদলে গেছে দেখুন, আজকের সেকশন ৮.১ থেকে মিলিয়ে নিন, লিংক-এর সংখ্যাটার জায়গাটা বদলে গেছে, এখন 'onefile' আর 'threefile' দুটোর বেলাতেই এই সংখ্যাটা এসেছে দুই। আরো একটা জিনিষ দেখুন সমস্ত দিক থেকে সমস্ত অর্থে 'onefile' আর 'threefile' হুবহু এক। কী মজা দেখুন, আমরা তো প্রথমে বানালাম 'onefile', তারপরে 'twofile', সবার শেষে 'threefile'। সময়ের স্ট্যাম্পটা দেখুন, 'twofile'-এর বেলায় '`10:50`', ঠিকই আছে, 'onefile'-এর '`10:49`' থেকে একমিনিট পরে। কিন্তু এমনই গোলমেলে ওই 'threefile' যে সে কিন্তু তার নিজের বাপের মানে 'onefile'-এর সঙ্গে একই ডেট-অফ-বার্থ টাইম-অফ-বার্থ শেয়ার করছে, কেলেংকারির একশেষ। আসলে বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক নয়, সম্পর্কটা একদম হুবহু প্রতিরূপের। এবার আসুন একদম বাঁদিকের আইনোড নম্বরে, সেটা কী বস্তু মনে আছে? আগের ছ নম্বর দিনে একটু আলোচনা আছে, আরো ভালো করে আজই আসবে। আমরা যাকে নামে চিনি, সেই ফাইলটাকে অপারেটিং সিস্টেম যা দিয়ে চেনে তাই হল আইনোড নম্বর। শুধু এইটা দেখুন, 'onefile' আর 'threefile'-এর আইনোড নম্বরটাও এক, যা কিন্তু 'twofile'-এর বেলায় সত্যি নয়। ঠিক একই জিনিষ দেখুন অনুমতির কাঠামোয়। 'onefile' আর 'threefile' এক মানে এক মানে এক।

এবার দেখা যাক 'onefile'-এ কিছু তথ্য যোগ করে। প্রথমে টাইপ করুন, আগেও করেছেন, '`cat > onefile`', এন্টার মারুন। দেখুন কমান্ড প্রম্পট হাওয়া হয়ে গেছে, নিচের লাইনে কার্সরের চৌকো আলোটা দপদপ করে আপনাকে ডাকছে, এসো এসো টাইপ করো। সত্যিকারের লিনাক্সী হয়ে ওঠার প্রমাণ হল যখন আপনি ডাকটা কানেও শুনতে পাবেন, তার জন্যে দরকার রোজ জিটাইপিস্ট (Gtypist) নিয়ে প্রাকটিস করা। গ্নু-র একটা ফ্রি সফটওয়ার। টাইপ শেখার ইশকুলে যা শেখায় তার চেয়ে তেরো হাজার পাঁচশো বারো গুণ ভালো করে শেখায়। আর বকে দেওয়াটা যা কিউট, সে আর কহতব্য নয়। ওই চৌকো আলোর জায়গাটায় আপনি হুবহু টাইপ করুন, স্পেস মানে স্পেস, অক্ষর মানে অক্ষর, '`onefile is one file`'। এবার এন্টার মারুন। মানে নিউলাইন, নতুন লাইনে চলে গেছে আমন্ত্রণী কার্সর। এবার আপনি জানেন কী করে ফাইলটা গোটাতে হবে, 'কন্ট্রোল-ডি' মেরে, মানে 'Ctrl' সুইচটা টিপে রেখে 'D' সুইচটা মেরে, তারপর দুটোই ছেড়ে দিয়ে। এবার একবার '`cat onefile`' করে দেখে

নিন, হুবহু এই টেক্সটটাই দেখাচ্ছে স্ক্রিনে। আপনি আপন টাইপমাধুরী মিশায়ে অন্য কিছু ভরতেই পারতেন ফাইলটায়, কিন্তু তাহলে টেক্সট-এর চিহ্নের হিশেবটা আবার বদলে যেত, হিশেবটা এখুনি আমাদের দরকার পড়বে। তার আগে একটু কুচো করে টাইপিং শিখে আসা যাক, ব্যাশ কী ভাবে আপনার ইতিহাসটাকে লিখে রাখে আপনারই অগোচরে, আপনার ইতিহাস মানে আপনার আদেশের ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে কী করে প্রয়োজন মাফিক ফেরত পাওয়া যায়।

৯.৩।। আদেশের ইতিহাস

আপনার কিবোর্ডের তিনখাবলা চাবিসংস্থানের মধ্যে একদম ডানদিকেরটা তো নিউমেরিক কিপ্যাড, অব্যবহারের ধুলো জমে জমে এমন কালো হয়ে যায় যে মাসআটেক বাদে বাদে যখন সুইচগুলো খুলে সাবানজলে ভেজাই, ওগুলোকে আলাদা করে স্কচব্রাউট দিয়ে মাজতে হয়। একদম বাঁদিকের মূল অংশটা হল সেই জায়গাটা আমরা প্রায় সব টাইপই যেখানে করি, উপরে সংখ্যার সারি, নিচে বর্ণমালা আর নানা চিহ্ন। আর এই দুইয়ের মাঝে এক খাবলা সুইচ। উপরে ছটা, নিচে চারটে। নিচের চারটে হল অ্যারো সুইচ।

এবার আপনাকে অসম্ভব শক্ত জটিল দুঃসাধ্য দুঃসাহসী রোমহর্ষক একটা টাইপিং করতে হবে, এই চারটে অ্যারো সুইচের মধ্যে চাতক সুইচটিকে, মানে যে অ্যারোটা উপরপানে মুখ করে আছে, ক্রিচ করে টিপতে হবে একবার করে, থেমে স্ক্রিন দেখতে হবে। একবার ক্রিচ করে থাকলে — এখন স্ক্রিনে আছে '`cat onefile`'। ক্রিচ ক্রিচ করে থাকলে স্ক্রিনে আছে '`cat > onefile`'। ক্রিচ ক্রিচ ক্রিচে '`ls -ail`'। আপনি আরো ক্রিচী মানুষ হতে চাইলে পরপর পেতে থাকবেন, পরপর, '`ln onefile threefile`', তারপর আসবে '`ln -s onefile twofile`', তারপর '`touch onefile`'। এইভাবে চলতেই থাকবে। আজ যা করেছেন, তার আগে যা করেছেন, তার আগে, তার আগে, গতজন্মেও চলে যেতে পারে, যদি আপনি তখন থেকে গ্নু-লিনাক্স শুরু করে থাকেন। এবং গতজন্ম থেকে এই অব্দি এক হাজারের বেশি কমান্ড না-দিয়ে থাকেন। কারন কমান্ড মনে রাখার এই প্যাঁচটা হল এক হাজারি মনসবদার। এর জমিদারি আরো বাড়ানো যায়, কী করে সেটা পরে শিখবেন।

এই দুঃসাধ্য ক্রিচকৌশলের আরো একটা উপায় আছে, 'কন্ট্রোল-আর', মানে 'Ctrl' সুইচটা টিপে রেখে 'R' সুইচটা মেরে, তারপর দুটোই ছেড়ে দেওয়া। এবার যে কমান্ডটা আপনি খুঁজছেন, ধরুন '`ls`', সেটাকে টাইপ করে দিন, '`l`' মারা মাত্র শেষ যে কমান্ডে আপনি '`l`' দিয়ে শুরু করেছেন সেটা চলে আসবে স্ক্রিনে, তারপর '`s`' মারা মাত্র শেষ যে কমান্ডে আপনি '`ls`' দিয়ে শুরু করেছেন সেটা চলে এসেছে। এবার আপনি ধরুন দেখলেন যে এটা নয়, এরও আগে আপনি যে '`ls`' ব্যবহার করেছেন সেটা পেতে চান, কোই বাত নেহি, আর একবার 'কন্ট্রোল-আর' (Ctrl-R)মারুন, তার আগেরটায় যেতে চাইলে আরো একবার, এই করতে করতে যেই ঠিক কমান্ডটায় পৌঁছলেন তখন আর একবার ক্রিচ করে দক্ষিণপন্থী অ্যারো সুইচটা টিপুন। দেখলেন ওই কমান্ডটা চলে এসেছে স্বাভাবিক কমান্ড প্রম্পটে, এখন এন্টার মারলেই কমান্ডটা কাজ করবে, যেন এইমাত্র আপনি টাইপ করে দিয়েছেন। এবার ধরুন দেখলেন যে কমান্ডটা মোটামুটি ঠিক আছে, একটু বদলাতে হবে। বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী তীরেরা আছে কি করতে। ওই দিয়ে কার্সর এগিয়ে পিছিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসুন, টাইপ করুন যা চান, আর ডিলিট (Delete) মারলে কার্সরে থাকা অক্ষরটা মুছে যায়, ব্যাকস্পেস (Backspace সুইচ বা ← সুইচ) মারলে কার্সরের বাঁদিকের অক্ষরটা মুছে যায়। কখনো কখনো একটা কমান্ড হতে পারে বেধড়ক লম্বা, গ্নু-লিনাক্সে কমান্ড প্রম্পটে তিন চার লাইনের কমান্ড হরহামেশাই ঘটে, তখন ডান বা বাঁ তীর মেরে মেরে পৌছনোটা ঝামেলার। কমান্ডটার একদম গোড়ায় চলে যাওয়া যায় 'কন্ট্রোল-এ' (Ctrl-A) মেরে, একদম শেষে চলে যাওয়া যায় 'কন্ট্রোল-ই' (Ctrl-E) মেরে। কমান্ড লাইনের এরকম আরো অনেকগুলো তরকিব আছে, খুবই সুবিধেজনক, তবে সেগুলো কাজে লাগানোর আগে আর একটু কাজের জটিলতা বেড়ে ওঠা দরকার।

এই যে আপনার আদেশের ইতিহাসের এক হাজারি মনসবদারি, এর দলিলটা একটু শো করে নেব? পর্চা ম্যাপ, দাগ ম্যাপ এসব পরে লড়ানো যাবে, যখন আমরা কাস্টমাইজেশন নিয়ে কথা বলব, কাস্টমাইজেশন মানে আপনার কাস্টমের সঙ্গে প্রথার সঙ্গে মিলিয়ে আপনার মর্জিমাফিক করে নেওয়া, মানে আপনার পাঁঠা কোথায় কাটবেন, লেজে না শিঙে, লেজ ক-পিস, শিঙ কী সাইজের চোকলায়, মাংস কোথায় যাবে, বদরক্ত কোথায়, ইত্যাদি। এর মূল জায়গাটা হল এনভায়র্নমেন্ট ভ্যারিয়েবলগুলো, সেগুলো কী — মনে করতে পারছেন? কোথায় এসেছিল কথাটা? যাকগে, ঠিক

সময়ে মনে পড়ে যাবে। পরে আমরা এগুলোয় আসব, আমরা যদি এই জিএলটি পাঠমালায় সেই ভাবে নাও আসি, আপনাকে নিজে নিজে আসতেই হবে, পাঠমালা অর নো পাঠমালা, নয়তো আপনার সিস্টেম চিরকালই একটা ডিফল্ট পাঁঠা হয়ে থাকবে, আপনার ব্যক্তিগত একান্ত জনান্তিক পাঁঠা হয়ে উঠবে-না, চেঁচাবে একদম পপুলার ডেমোক্র্যাটিক হাটুরে ব্যাব্যারবে। পাঁঠা না গাধা? আমরা তো শূন্য নম্বর দিনে সিস্টেমকে গাধা বলে ডেকেছিলাম? আপনার হোম সুইট হোম ডিরেক্টরিতে দাঁড়িয়ে একবার '`ls`' মারুন। একটু জোরে মারুন, মানে জোরে কী-বোর্ডে মারবেন না, একটু জোরালো এলএস মারুন — '`ls -a`', যাতে ডটানন ফাইলগুলোকেও দেখায়, ডটানন ফাইলগুলোকে মনে আছে, ছয় নম্বর দিনের এক নম্বর সেকশনে? যাদের গোড়াতেই একটা ডট মানে বিন্দু মানে '.' থাকে, যাদের এমনিতে সিস্টেম দেখায়না? ডটানন কিন্তু শুধু ফাইল না, গোটা গোটা ডিরেক্টরি অব্দি ডট মুখে বসে থাকে। আমার নিজের সিস্টেমে একবার মেরে শো করে দি, দাঁড়ান।

.AbiSuite	**.ICEauthority**	.X.err	.Xauthority	.Xdefaults
.Xmodmap	.Xresources	**.adobe**	.bash_history	.bashrc
.blackboxrc	.cdrdao	.dvipsrc	.emacs	**.emacs.d**
.esd_auth	.exrc	**.fltk**	**.fonts**	.fonts.cache-1
.fonts.conf	**.gconf**	**.gconfd**	**.gnome**	**.gnome2**
.gnu-emacs	.gtkrc-kde	**.kde**	.kderc	.kermrc
.links	.mailcap	**.mcop**	.mcoprc	.mime.types
.mozilla	**.mplayer**	.muttrc	.padminrc	.profile
.qt	.recently-used	.skel	.sversionrc	**.thumbnails**
.urlview	.viminfo	**.wine**	.wmrc	.xcoralrc
.xemacs	.xim	.xinitrc	**.xmms**	.xserverrc.secure
.xsession	.xsession-errors	.xtalkrc	.y2log	**.yast2**

এই তালিকাটা একটু বদলে নিলাম, দেখানোর সুবিধের জন্যে, আর, '`ls -a`' সব ফাইল আর ডিরেক্টরিগুলোকেই দেখিয়েছিল, তার থেকে আমি শুধু ডটানন ফাইল আর ডিরেক্টরিগুলোকে বাদ দিয়ে দিলাম, যেগুলো আপনি এমনিতেই '`ls`' মেরে দেখতে পেতেন। আর এর মধ্যে ডিরেক্টরিগুলোকে আমি ব্লক করে দিলাম বোঝার সুবিধের জন্যে।

এবার, প্রশ্ন আপনার আদেশের ইতিহাস ধরে রাখার গল্পটা থাকছে কোথায়? এর জন্যে একটা কমান্ড লাগে, যার নাম 'set'। এই '`set`' একবার মেরে তারপর এন্টার মেরে দেখুন, আবার সেই শচারেক লাইন হুড়হুড় করে বেরিয়ে যাওয়ার গল্প। যেমন আমি সেট মেরে দেখলাম, আমার সেট খুব ছোটো, মাত্র তিনশো বিরাশি লাইনের, আপনার সেট কত লাইনের — আপনি গুনতে জানেন তো? না জানলে, এই পাঠমালাটা আর একবার গোড়া থেকে পড়তে পড়তে আসুন, দেখুন কোথাও আছে কিনা? এত বাজে বকেছি কনস্ট্যান্টলি, গোটাটা একটা শব্দকল্পদ্রুমের মত হয়ে গেছে, কী আছে আর কী নেই, অনেকটা আমার লেখাপড়ার টেবিলের মত, যাতে নাকি কু-লোকে বলে, হাতি হারালেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। একদমই বাজে কথা, আজ পর্যন্ত এত বছরে কোনোদিন কোনো হাতি ওখানে হারায়নি। এখানে সেই সেট মেরে পাওয়া শশ-লাইনের কয়েকটা মাত্র তুলে দেওয়া যাক, দেখুন তো বুঝতে পারেন কিনা। মনে রাখবেন, এটা কিন্তু আমি, ইউজার 'dd', সেট মেরেছিলাম আমার সুজে অপারেটিং সিস্টেমে, আর কোনো একজন ইউজার সেট মারলে কিন্তু অন্য একটা টেক্সট পাওয়া যেত।

```
BASH=/bin/bash
HISTFILE=/home/dd/.bash_history
HISTSIZE=1000
HOME=/home/dd
PATH=/home/dd/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome2/bin:/opt/gno
    me/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/java/jre/bin:/opt/gnome/bin
INFOPATH=/usr/local/info:/usr/share/info:/usr/info
MANPATH=/usr/local/man:/usr/share/man:/usr/X11R6/man:/opt/gnome2/man:/opt/gnome/man
LANG=en_US
LOGNAME=dd
OSTYPE=linux
```

PS1='\u@\h:\w> '
PWD=/home/dd
SHELL=/bin/bash

এর দ্বিতীয় লাইন দেখুন, 'HISTFILE=/home/dd/.bash_history', এর মানে, আদেশের ইতিহাসটা রয়ে যায় ওই '/home/dd/.bash_history' ফাইলে। আর এর এক হাজারি মনসবদারির আয়তনটা লেখা আছে এখানে তৃতীয় লাইনে 'HISTSIZE=1000'। এবার একটা জিনিষ খেয়াল করুন, এর প্রতিটা লাইনে একদম বাঁদিকে একটা কথা লেখা, ক্যাপিটাল কেস বা বড় হাতের ল্যাটিন বর্ণমালায়, তার পর একটা সমান-চিহ্ন, তারপর ডানদিকে একটা কথা লেখা ছোট হাতের বর্ণমালায়। কাঠামোটা খেয়াল করুন, বাঁদিকের ওই বড় হাতের লেখা কথাগুলোই হল সিস্টেম ভ্যারিয়েবল। ভ্যারিয়েবল বলতে বোঝায় চলরাশি, যা চলে বেড়ায়, বদলে যায় এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায়, এক জন থেকে আর এক জনে, এক সিস্টেম থেকে আর এক সিস্টেমে। এর উল্টো হল কন্সটান্ট বা স্থিররাশি। যা কখনো বদলায় না। এই শব্দগুলো পাওয়া যায় গণিতে, পদার্থবিদ্যায়, অর্থনীতিতে, যে কোনো বিজ্ঞানে। আমাদের বাস্তব পৃথিবীতেও চলরাশি আর স্থিররাশি আছে, যেমন বৃত্তের ক্ষেত্রফল বার করার সময় যে 'π' বা 'পাই'-কে পাই আমরা, সেটা একটা স্থিররাশি বা কন্সটান্ট। কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় এর মান বদলাবে না। ইচ্ছে হলে একদিন বিকেল বিকেল বৃহস্পতিতে বা সকাল সকাল শনিতে গিয়ে একটা বৃত্ত মেপে দেখুন, সেখানেও এর মান সেই একই হবে। কিন্তু অন্য অনেককিছু আবার ভ্যারিয়েবল বা চলরাশি। আমাদের কার কত টাকা আছে এটা মানুষ থেকে মানুষে বদলায়, তাই ভ্যারিয়েবল। একটা বইয়ের চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টারে কত করে শব্দ আছে সেটা একটা চলরাশি। আবার কটা আদেশ অব্দি সিস্টেম মনে রেখে দেবে, এটাও একটা ভ্যারিয়েবল। এখানে বলা আছে যে এর সাইজ 'HISTSIZE' হবে একহাজার। শেলের খোঁজার পাথ বা পথনির্দেশ ব্যাপারটা মনে পড়ছে, পাঁচ নম্বর দিনের আলোচনা থেকে? 'dd' নামের কোনো ব্যবহারকারী কোনো আদেশ দেওয়ামাত্র যেখানে যেখানে শেল খুঁজে দেখবে, ওই আদেশটার মানে কী, সেই পথনির্দেশটা দেখুন দেওয়া আছে, 'PATH' নামের ভ্যারিয়েবল। অন্য নামের ভ্যারিয়েবলগুলো নিজেই আন্দাজ করার চেষ্টা করুন। প্রথম লাইনেই দেওয়া আছে, আমার 'BASH' নামের সফটওয়ারটা, যা আমার শেল, সেটাকে কোথায় পাওয়া যাবে। আবার আমার শেল যে ওই ব্যাশই, সেটা দেওয়া আছে এখানে তোলা লাইনগুলোর শেষ লাইনে, 'SHELL' নামের ভ্যারিয়েবল। 'PS1' নামের ভ্যারিয়েবলটা আসলে আমার কমান্ড প্রম্পট কেমন দেখতে হবে সেটা বলে দিচ্ছে। ডানদিকেরটা একটা ছক বা টেমপ্লেট, যেখানে মানগুলো শেল নিজেই ভরে নেবে, শুধু একটা জিনিষ মনে রাখুন, '\' চিহ্নটা আসলে বলে দেয় শেলকে যে এর পরের কথাটাকে তুমি আক্ষরিকভাবে নাও। পরে বুঝে যাবেন পুরোটা। এখানে তোলা লাইনগুলোর দ্বিতীয় লাইনে লেখা '/home/dd/.bash_history' হল আমার বা 'dd' নামের ইউজারের আদেশের ইতিহাস লিখে রাখার জায়গা। '`less /home/dd/.bash_history`' কমান্ড দিয়ে আমি পাব আমার শেষ ব্যবহার করা একহাজারখানা আদেশের তালিকা। আপনি পাবেন আপনার হোমের '.bash_history' ফাইলে।

এবার প্রশ্ন হল, ভ্যারিয়েবলগুলোর মান যে এটাই এটা শেলকে বলে দিল কে? আমাকে তো শেল কোনোদিন ফোন করেছে বলেও মনে পড়ে-না? তাহলে? নিজেই খুঁজে দেখুন তো? একটু মনে করিয়ে দিই। এই ফলাফলটা পাওয়া গেছিল 'set' কমান্ড দিয়ে। তার মানে আপনি '`man -k set`' কমান্ড লাগাবেন, ছ নম্বর দিনের থেকে মনে করুন। বা সরাসরি '`man set`' কমান্ড-ও দিতে পারেন। এই কমান্ড দিয়ে যা পাবেন সেটা হল 'bash'-এর ম্যানুয়াল পেজ, মানে '`man bash`' দিয়ে যা পেতেন, কারণ, এই 'set' হল সরাসরি 'bash'-এর কাজ। এবার ম্যান পেজ তো পেলেন, পড়ে ফেলুন, একাধিকবার। এই বিশেষ সমস্যাটায় আপনি খুঁজছেন কনফিগারেশন ফাইলগুলোর নাম, তো গুড, একটু চালিয়াতি খেলার চেষ্টা করা যাক, আপনি তো জানেন ম্যান পেজে বা লেসে কী করে খুঁজতে হয় একটা বিশেষ শব্দবন্ধ, '\' টাইপ করুন, দেখুন একদম নিচে সেটা ফুটে উঠেছে, এবার টাইপ করে দিন 'file' শব্দটা। এন্টার মারুন। প্রথম যেখানে 'file' আছে সেখানে আপনাকে নিয়ে গেল, ঠিক জিনিষটা না-পেলে আবার একবার '\' মারুন। এবার আর কিছু টাইপ না-করেই এন্টার মারুন। ও আপনাকে দ্বিতীয় যেখানে 'file' সেখানে নিয়ে গেল। না-পেলে আবার করুন। আর একটু হেল্প করব? আপনি পঞ্চমবার 'file' যেখানে পাবেন, সেখানেই পেয়ে যাবেন এই তথ্যটা — '`set`' মেরে আমি যে তালিকাটা পেয়েছিলাম, যার কয়েক লাইন তুলে দিলাম, সেই তালিকাটা 'bash' পাচ্ছে এই চারটে ফাইল থেকে, '/etc/profile', '~/.bash_profile', '~/.bash_login' এবং '~/.profile'। একটু আগে যে ডটানন

ফাইল আর ডিরেক্টরির একটা টেবিল আমরা বানিয়েছিলাম, তাতে কি এদের কারোর নাম আপনি পেয়েছিলেন? শুধু একটাই জিনিষ, এই তেরাবেঁকা '~' চিহ্নটা কী বস্তু? আমরা যে যেরকম ঘরেই থাকি-না কেন, দশ বাই দশ, চোদ্দ বাই চোদ্দ, যাই হোক, তার দেওয়ালগুলো যতই সোজাসোজা হোক, এই তেরাবেঁকা ত্রিভঙ্গমুরারি টিল্ড-ই হল আপনার হোম, আমার হোম, সবার হোম। যখনই কেউ '~' টাইপ করে, সিস্টেম জানে সে কে, বুঝে নেয় যে এটা তার হোম, যেমন আমার বা 'dd' নামের ইউজারের বেলায় এই '~' মানে '/home/dd/'। 'atithi' ইউজার হলে '~' মানে '/home/atithi/'।

আদেশের ইতিহাসের সূত্রে একটু সিস্টেম কনফিগারেশন জানা হল আমাদের, পরে আবার আসব আমরা এইসব কথায়, এখন ফিরে যাওয়া যাক আমাদের লিংক নিয়ে আলোচনায়।

৯.৪।। হার্ড লিংক

এখন আমরা জানি কী করে আগের আদেশ ফেরত আনে সিস্টেম, এবার, সেই ফেরত আনা আদেশ দিয়ে আর একবার আমরা '`ls -al`' কমান্ডটা মারব এই 'onefile', 'twofile', আর 'threefile'-এর উপর। এবার আর আমরা '`ls -ail`' মারবনা, কারণ এই তিনটে ফাইলের আইনোড নম্বরের চক্করটা তো আমরা ইতিমধ্যেই জানি। এখন আমাদের 'onefile' কিন্তু বদলে গেছে, একটু আগেই আমরা তাতে টেক্সট ভরেছি '`onefile is one file`' — এই সমস্ত চিহ্নগুলো পরপর, যার মধ্যে ষোলটা অক্ষর আছে, ফাঁকা জায়গা বা স্পেস আছে তিনটে, এবং তারপর একটা অদৃশ্য চিহ্ন, যার নাম নিউলাইন বা নতুন-লাইন। '`ls -al`' মেরে দেখা যাক।

```
-rw-r--r--   2  dd  users    20 2003-12-24 10:51 onefile
lrwxrwxrwx   1  dd  users     7 2003-12-24 10:50 twofile -> onefile
-rw-r--r--   2  dd  users    20 2003-12-24 10:51 threefile
```

এবার দেখুন 'onefile' আর 'threefile' দুটোরই বাইটসাইজ দেখাচ্ছে কুড়ি করে, আর বেচারা 'twofile', তার কোনো বদল হলনা গা, এটা কি একটা বিচার হল, যার সঙ্গে সে লিংকিত, নয় একটু কোমলতার সঙ্গেই, সফট লিংক না, সেই 'onefile' ফনফন করে বেড়ে উঠল শূন্য থেকে কুড়ি, ফুটপাথ ফাটিয়ে মাথা-গজানো দুর্বোঘাসের মত যারা বারবার প্রমাণ করে, স্টিল স্প্রিং ইজ স্প্রিং ইভন ইন দি টাউন। তার সঙ্গে একই ভাবে বেড়ে গেল ওই আর একটা লিংক 'threefile', নয় একটু হার্ড। আর সে 'twofile' সেই সাত এক্কে সাতের নামতা? দেখুন তো কুড়ি সাইজটা কি আপনার চেনা লাগছে? ষোল আর তিন আর এক যোগ করে কত হয় যেন? এবার দেখুন তো, ওই সাতের রহস্যটার কোনো মানে বুঝছেন? ওই সংখ্যাটাতেই, সফট লিংকের বাইটসাইজেই, লেখা নেই তো গরবিনী নরম-লিংকিনীর প্রাণের কানুর নাম? '`onefile`' নামে কটা অক্ষর? একটু আগে ৯.১ সেকশনে আমি আপনার বানানো সফট-লিংক ফাইলের সাইজ বলে দিচ্ছিলাম মূল ফাইলের নামটার অক্ষর গুনে। প্রত্যেকটা উদাহরণেই গুনে দেখুন। সফট লিংকের বুকে শুধু লেখা থাকে তার নাম যার সে লিংক।

আর 'threefile' কেন বাইটসাইজ কুড়ি সেটা তো আপনারা আগেই জানেন, এটা হল 'onefile'-এর একটা হুবহু প্রতিরূপ। যে কারণে, লিংকসংখ্যার জায়গায়, 'onefile' আর 'threefile' দুজনেরই লেখা আছে দুই। কোনো দিক দিয়েই 'onefile' আর 'threefile'-এর ভিতর কোনোরকম কোনো পার্থক্য করা যায়না, এরা দুজনে তো আসলে একটাই ফাইল, শুধু দুটো আলাদা নাম দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি একটাই ফাইলকে। যে কারণে তাদের আইনোড নম্বর এক, সেই আইনোড নম্বর যা দিয়ে সিস্টেম একটা ফাইলকে বোঝে, যাকে আমরা বুঝি তার নাম দিয়ে। তাই আমরা যাকে 'onefile' আর 'threefile' এই দুই নাম দিয়ে বুঝছি সে আসলে একটাই আইনোড নম্বর, সিস্টেমের কাছে একটাই ফাইল। দুই আলাদা নামে তাকে রাখার ফলে ঘটেছে এটাই যে একটাকে উড়িয়ে দিলেও অন্য নামটা রয়ে যাবে, তাই আইনোড নম্বরটাও, তাই ফাইলটাও, সিস্টেম তাকে ওড়াতে পারবেনা, যতক্ষণ না তার শেষ হার্ড লিংকটাও উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। মূল ফাইল 'onefile'-কে উড়িয়ে দিয়ে দেখুন, আর সফটলিংক 'twofile' ফাইলকে ক্যাট করে আপনি দেখতে পাবেন না, সিস্টেম আপনাকে জানাবে, মূল ফাইল 'onefile' আর নেই। কিন্তু 'onefile' উড়িয়ে দিয়েও '`cat threefile`' করুন, দেখবেন অবিকল মূল ফাইলটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন।

যেসব পরিস্থিতিতে আমাদের লিংক ফাইল ব্যবহার করতে হয় তার কোথাও কোথাও সফট লিংক করা যায়না, হার্ড লিংক করতেই হয়, তার কারণ, অনেক প্রোগ্রামই আছে যারা সিম্বলিক লিংক বোঝেনা। ধরুন কপি করার আমাদের

যে কমান্ড ‘cp’। এই ‘cp’ কোনো সিম্বলিক লিংকের উপর ব্যবহার করলে সে সিম্বলিক লিংকের লিংকত্বটাই বোঝেনা, নিট ফাঁপা নামাবলীটাই কপি করে আনে, মূল ফাইল কপি হয়না। এটা হার্ড লিংকের বেলায় হওয়ার কোনো চান্সই নেই। হার্ড লিংক তো জাস্ট আর একটা নাম, আর নাম যাই হোক, সে তো বাস্তব একটা ফাইল, আর বাস্তব তথ্য নিয়ে বাস্তব একটা ফাইল তো কপি হবেই। তবে ‘cp’ কমান্ডটাকেও সিম্বলিক লিংক নিয়ে কাজ করানো যায়, সেই রকম অপশান আছে। . . . *খেজুরগাছে . . .*

কিন্তু হার্ড লিংকের কঠোরতায় কখনো কখনো ব্যথাও লাগে যখন জানা যায় এই কঠিন যোগাযোগ কখনো দুটো আলাদা ফাইলসিস্টেমের মধ্যে ঘটতে পারেনা। মূল ফাইল আর লিংক দুটোকেই একই ফাইলসিস্টেমে থাকতে হবে। দেখেছেন, গরু তার শিঙে যা নিয়েই ঘুরুক, তার পথ শেষ হয় শ্মশানে, আমরা ফের ফেরত এসেছি ফাইলসিস্টেমে, যেখান থেকে, আমরা হার্ড ডিস্ক পার্টিশন আর ব্লকের কাহিনীতে যাওয়ার আগে, আগের ছ নম্বর দিনে, ডিভাইস, ডিভাইস ফাইল আর নাম নিয়ে আলোচনা শেষ করার পর, অন্য কিছু কথা বলে নেওয়ার দরকারে আজ শুরু থেকেই চলে গেছিলাম ফাইলের অনুমতি মালিকানায়, তারপর লিংকে। মধ্যে একটু কমান্ডের ইতিহাস তথা ব্যাশ-এর কনফিগারেশন ফাইল নিয়েও কথা বলে নিয়েছি। এবার ফেরত আসা যাক আমাদের মূল আলোচনায়, মানে ফাইলসিস্টেমে।

১০।। হার্ডডিস্ক, পার্টিশন

শূন্য নম্বর দিনে হার্ড ডিস্কের ভিতরে প্ল্যাটার আর হেডগুলোর কাজ করার কায়দাটা মনে আছে? একটা ডিস্ক মানেই কয়েকটা করে প্ল্যাটার। থালার সোজা আর উল্টো আছে, কিন্তু প্ল্যাটারের দুটো দিকই সোজা দিক, তাই প্ল্যাটার পিছু দুটো করে তল যেখানে চৌম্বক পদার্থের উপর তথ্য লেখা যায় চৌম্বক পদার্থের উপর লেখার কায়দা সম্পন্ন ঘুরতে এবং নড়তে থাকা হেড দিয়ে, মনে পড়ছে? এবারে সেটা একটু ভালো করে বুঝি। সেখান থেকে আমরা পার্টিশন এবং ফাইলসিস্টেম বোঝার দিকে যাব। ছয় নম্বর দিন থেকে যে প্রসঙ্গটা শুরু হয়েছে এবার আমরা তার ফিনিশের দিকে যাচ্ছি, ছয়ের আলোচনাগুলো একটু মাথায় এনে নিন। ফাইল, ফাইলনাম, ফাইলের রকম। ডিরেক্টরিসিস্টেম বা ডিরেক্টরিব্যবস্থা। মানে সিঁড়িভাঙার মত করে স্তরে ডিরেক্টরি এবং ফাইলের রাখার বন্দোবস্ত। বহুসময় চালুকথায় একেও আমরা ‘ফাইলসিস্টেম’ বলি। তবে, এটা স্বীকৃত ব্যবহার নয়। ‘ফাইলসিস্টেম’ শব্দটার স্বীকৃত এক নম্বর ব্যবহার মানে হল গোটা ঐক্যবদ্ধ ফাইল এবং ডিরেক্টরির সমগ্রতা। ‘ফাইলসিস্টেম’ শব্দটার স্বীকৃত দু-নম্বর ব্যবহার হল ফাইল বানানো পড়া লেখা এবং রাখার নানা রকম — যে আলোচনায় আমরা এখনো আসিনি, শুধু এদের দুচারটে নামের উদাহরণ দেওয়া ছাড়া, এক্সএফএস, ইএক্সটিটু, ফ্যাটথার্টিটু, ইত্যাদি। এক নম্বর ফাইলসিস্টেম আলোচনার সূত্রে এল পার্টিশন এবং ডিভাইস নিয়ে খুব প্রাথমিক কিছু কথা। তারপর ডিভাইস, ডিভাইস ফাইল, তারপর এল ফাইলের অনুমতি এবং অধিকারের আলোচনা। তারপর ফাইল লিংক। তারপর আমরা মাইল্ডলি একটু কুপথে গেছিলাম, ডাইগ্রেস করেছিলাম ব্যাশ এবং তার কনফিগারেশনের প্রসঙ্গে। এবার আবার আমরা ফেরত আসছি ফাইলসিস্টেমের কথায়, পার্টিশনটাকে বুঝে আমরা যাব ফাইলসিস্টেমের দু-নম্বর ব্যবহারটা নিয়ে দুচার কথায়, তারপর শেষ করব গ্নু-লিনাক্সের ফাইলসিস্টেম হায়েরার্কিব্যবস্থার স্বতন্ত্র স্বীকৃত এবং গৃহীত আকার নিয়ে কথায়।

১০.১।। হার্ডডিস্কের ভৌত জ্যামিতি — সেক্টর, ট্র্যাক, সিলিন্ডার, পার্টিশন

এখানে এই ছবিতে আমরা তিনটে প্ল্যাটার দেখিয়েছি, তার মানে তিন দুগুনে ছ-খানা তথ্য লেখার তল, প্রতি তলে তথ্য লেখার জন্যে একখানা করে হেড, তার মানে ছ-খানা হেড। শুধু তলগুলোকে আমরা এক থেকে ছয় না-গুনে, গুনেছি শূন্য থেকে পাঁচ, সেটাই প্রথা। দেখুন দেখানো আছে পরপর। ছটা তলে মোট ছটা হেড একই তালে নড়ে, একই সঙ্গে, একা একা আলাদা করে নাড়ানো যায়না। তার মানে, খেয়াল করুন, যে কোনো একটা নড়াচড়া মানেই ছ-খানা হেডের একই সাথে নড়া, একই ভাবে, একই গতিতে, ছটা আলাদা আলাদা তলের উপর। এদের এই গতির ঐক্য থেকেই গড়ে উঠেছে হার্ডডিস্কের ভৌত ভূমিকে বোঝার আমাদের একক, যার নাম সিলিন্ডার।

থ্রি-অ্যান্ড-হাফ-ইয়ার্ডস-ই তো নাম, সেই গল্পটার কথা মনে করুন, যতটা জমি একসঙ্গে তুমি দৌড়তে পারবে, ততটা জমিই তোমার — লোকটা তাতে এমন দৌড় দৌড়লো যে শেষ অব্দি দৌড়তে দৌড়তে জমিতেই পড়ে গেল, অত অত জমির কিছুই লাগল না, লাগল মাত্র থ্রি-অ্যান্ড-হাফ-ইয়ার্ডস, কত জমি আর লাগবে, যত বড় দৌড়বাজেরই হোক,

লাশ তো। হার্ড ডিস্কের বেলায় শুধু এই একা একলা একটা দৌড়বাজকে রিপ্লেস করে দিন ছ-খানা দৌড়বাজ হেড দিয়ে। মালেরা দৌড়চ্ছেও একই তালে, এই ছ-খানা হেডের কমিউন। প্রত্যেকে যতটা করে দৌড়চ্ছে তার পরিমাণ সমান — সেই পরিমাণের ছয়গুণ হল কমিউনের মোট জমি। একটা হেডের একটা দৌড়ের ছ-খানা প্রতিরূপ তৈরি হচ্ছে তিনটে প্ল্যাটারের ছটা তলে ছখানা হেডের ছটা দৌড়ে। আমরা এখানে তিনটে প্ল্যাটার দেখিয়েছি বলে ছজনের কমিউন, প্ল্যাটার বাড়া মানেই দৌড়বীর বাড়া, সেই একই হারে বেড়ে যাওয়া কমিউনের জমি। দেখুন, এই যে কমিউনের জমির ধারণাটা তৈরি হয়ে গেল, এটাই আমাদের কাজে লাগবে। এই জমিটা ঠিক কীরকম হবে? প্রতিটা প্ল্যাটারের প্রতিটা তলে একই ভৌগোলিক সংস্থানে থাকবে এই জমি। যেমন দেখুন একটা তলে একটা হেডের এক সেক্টর জমির ঠিক ছ-খানা প্রতিরূপ থাকবে ছখানা তলে। এর ছটা টুকরো জমিকে মিলিয়ে তৈরি হবে কমিউনের জমির একটা সেক্টর। মাইরি, ছবিটা দেখে বোঝার চেষ্টা করুন, হাউ-টু ডকুমেন্টের একটা ছবির একটু ব্যবহার করে, অনেক পরিশ্রমে, কাল বড়দিনের রাত্তিরে পৌনে বারোটা অব্দি, আজ আবার ভোরে সোয়া চারটে থেকে প্রায় তিনঘন্টা গাবিয়ে ছবিটা পাকানো।
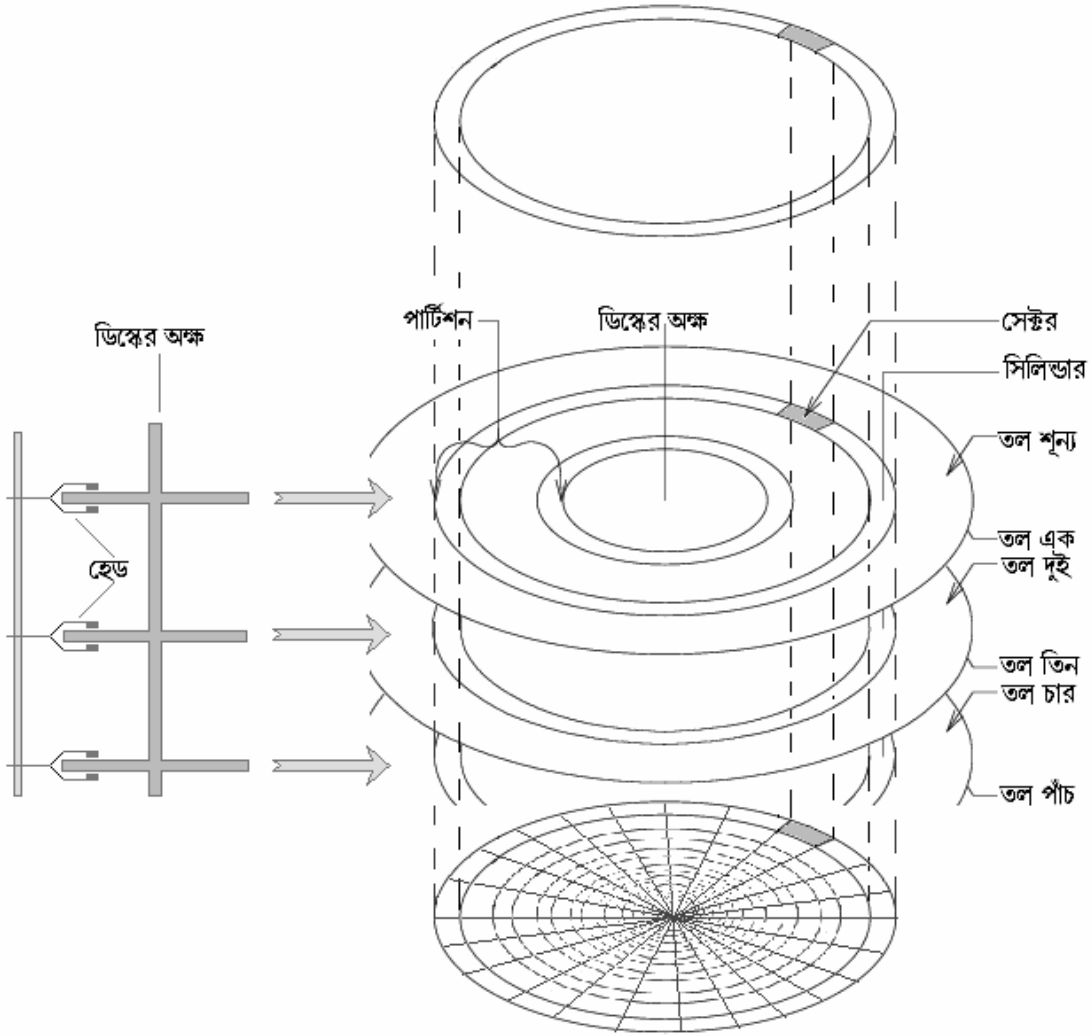
এক একটা তল মানে একগুচ্ছ কনসেন্ট্রিক বা সমকেন্দ্রিক বৃত্ত, ছবির একদম নিচে দেখুন, একটা তলকে আমরা দেখিয়েছি। এই সমকেন্দ্রিক বৃত্তগুলো হল ট্র্যাক, পরপর ক্রমানুসারী সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত। শূন্য নম্বর তলে ঠিক যেখানে আছে এক নম্বর ট্র্যাক, তার ঠিক খাড়াখাড়ি উপরে বা নিচে রয়েছে অন্য প্রতিটা তলেরই এক নম্বর ট্র্যাক। প্রতিটি নম্বরের ট্র্যাকের বেলাতেই এটা সত্যি। তার মানে, প্রতি নম্বরের ট্র্যাক আছে ছ-খানা, ঠিক খাড়াখাড়ি উপরে-নিচে, তিনটে প্ল্যাটারের ছ-টা তলে। যদি প্ল্যাটারের সংখ্যা বেশি হয়, প্রতি কমিউনে একই নম্বরের ট্র্যাকও বাড়বে।

প্ল্যাটার চারটে হলে একই নম্বরের আটটা ট্র্যাক থাকবে এক একটা কমিউনে, পাঁচটা প্ল্যাটার থাকলে দশটা — এই ভাবে সংখ্যাটা বাড়বে। এবার খাড়াখাড়ি প্ল্যাটারগুলোকে পরপর একই সঙ্গে ভাবুন, যেভাবে আমরা ছবিতে ভাঙা দাগ দিয়ে দেখিয়েছি, প্রত্যেকটা প্ল্যাটারের প্রতিটি একই নম্বরের ট্র্যাককে একসঙ্গে নিয়ে এক একটা কমিউনকে আমরা একটা খাড়া সিলিন্ডার বা চোঙ আকারে ভাবতে পারি। এক একটা সিলিন্ডার তৈরি হচ্ছে ঠিক যেকটা প্ল্যাটার আছে তার দ্বিগুণ সেক্টর নিয়ে, আমাদের ছবির বেলায় ছটা। একটা সেক্টর বেয়ে একটা হেড নড়ছে মানে গোটা সিলিন্ডার বেয়ে ছটা হেড নড়ছে। মাথায় রাখবেন, এটা কিন্তু একটা ভৌতিক চোঙ, আমরা আমাদের চিন্তায়, বুঝবার সুবিধের জন্যে বানিয়ে তুলছি। বাস্তব হার্ডডিস্কটা আদৌ এরকম চোঙদার নয়।

এবার আমরা গোটা হার্ডডিস্কটাকে ভেবে ফেলতে পারি এইরকম কিছু সিলিন্ডারের সমাহার হিশেবে। মোট কটা সিলিন্ডার তাহলে হতে পারে একটা হার্ডডিস্কে? ঠিক যেকটা ট্র্যাক বা সমকেন্দ্রিক বৃত্ত আছে এক একটা তলে সেইকটাই সিলিন্ডারের সমাহার বলে ভাবা যাবে হার্ডডিস্কটাকে। গোটা ডিস্কটা কিন্তু ঘুরছে একই সঙ্গে, আমার মেশিনের হার্ডডিস্কের বেলায় মিনিটে পাঁচ হাজার চারশো বার করে, আরো দামি হার্ডডিস্কের বেলায় গতিটা আরো বেশি। হার্ডডিস্কটা ঘোরার মানে ঘুরছে তার মধ্যে ছখানা তল, আর তাদের উপর দিয়ে নড়ছে ছখানা হেড, একই সঙ্গে ছজন ছটা তলে ছটা আলাদা আলাদা ট্র্যাক বেয়ে, যে প্রত্যেকটা ট্র্যাকেরই তার নিজের তলে একই ক্রমিক নম্বর। প্রতিটা ট্র্যাককে আবার ভাবা হয় ছোট ছোট টুকরোয় যাদের নাম সেক্টর। ছবিতে দেখুন আমরা একটা সেক্টরকে দেখিয়েছি। সচরাচর এক সেক্টর মানে পাঁচশো বারো বাইট তথ্য। তার মানে গোটা হার্ডডিস্কের তথ্য রাখার ক্ষমতা দাঁড়ালো — (পাঁচশো বারো) × (প্রতি ট্র্যাকে সেক্টরের সংখ্যা) × (প্রতি তলে ট্র্যাকের সংখ্যা) × (তলের সংখ্যা) = (পাঁচশো বারো) × (প্রতি ট্র্যাকে সেক্টরের সংখ্যা) × (প্রতি তলে ট্র্যাকের সংখ্যা) × (প্ল্যাটারের সংখ্যা × দুই)। সচরাচর আমরা ডিস্ক নিয়ে কথা বলি যখন, এই সিলিন্ডার আর সেক্টরের নিরিখেই বলি। তল, ট্র্যাক এইসব রোজকার কথায় আসেনা।

ছয় নম্বর দিনে যাদের নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি তাদের ফাইলসিস্টেমের আকার বুঝতে গিয়ে, হার্ডডিস্কের পার্টিশনগুলোকে আবার ভাগ করা হয় এই সিলিন্ডারের সীমানা বরাবর। প্রথম দিকে, ইনস্টলেশনের সময়, অনেককেই দেখেছি চটে যেতে, কেন আমি ঠিক যে সাইজের পার্টিশন হবেনা? যেটা হচ্ছে সেটা দেওয়া ফিগারটার খুব কাছাকাছি, কিন্তু হুবহু সেইটা হবেনা কেন? হয়না ঠিক এই জন্যে। আমি যত মেগাবাইটের পার্টিশন চাইছি, ঠিক সেটা করতে গেলে হয়ত একটা সিলিন্ডারকে ভেঙে ফেলতে হচ্ছে। একটা সিলিন্ডারে ঠিক যতটা তথ্য আসতে পারে, হিশেব করে বার করে নিন, এবার তার কোনো সঠিক মাল্টিপল বা গুণিতকে দিন আপনার কাঙ্খার পার্টিশনের আকার, দেখবেন একদম খাপে খাপে সেটাই করছে। অর্থাৎ প্রতিটি পার্টিশন শুরু হবে হুবহু একটা সিলিন্ডারে, আবার শেষ হবে হুবহু একটা সিলিন্ডারে। পার্টিশনটার ভিতরকার আর বাইরেকার পরিধি, ছবিটার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। একটা নির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ সিলিন্ডারের বৃত্তে শুরু হবে, গোটাটা নিয়ে, আবার শেষ হবে আর একটা নির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ সিলিন্ডারের বৃত্তে, গোটাটাকে নিয়ে।

কিন্তু এখানে মৃদু ঘাপলা আছে একটা, পার্টিশনের সিলিন্ডারগুলোর মাপজোক রাখার জন্যে যে পার্টিশন টেবিল, তাতে জায়গা থাকে মাত্র বল লিখে রাখার জন্যে জায়গা থাকে মাত্র দশ বিট। দশ বিট জায়গা মানে কতটা তথ্য রাখা যায়, হিশেব করে বলুন তো? যদি না-পারেন, তো মনে করে বলুন, শূন্য নম্বর দিনে গাণিতিক তথ্যের মাপজোকের সূত্রে আমরা আলোচনা করেছি, না-পারলে দেখে নিন, মোট তথ্য রাখার সীমা ১০২৪। মানে ১০২৪-টা অব্দি আলাদা আলাদা সম্ভাবনাকে হাজির করা যায়। তাই, একটা পার্টিশনেরও সিলিন্ডার সংখ্যার চূড়ান্ত সীমা ওই ১০২৪। এই ঝামেলার জন্যে হার্ডডিস্কের সিলিন্ডারের চূড়ান্ত সীমা হত ১০২৪। এই সমস্যার সমাধান হয়েছে এলবিএ (LBA — **L**ogical/**L**arge/**L**inear-**B**lock-**A**ddressing/**A**rray) এসে। সেখানে এই ভৌত সিলিন্ডারের ধারণাটাকে বদলে নেওয়া হয় একটা যুক্তিনির্মিত বা লজিকাল ছকে। একটা একমাত্রিক ঋজুরেখ ব্লকের সারি বলে ভাবা হয় গোটা হার্ডডিস্কটাকে। ঠিক একটা সরলরেখায় যেমন পরপর বিন্দু আসতে থাকে, গতিটা ঘটতে পারে কেবল একটা মাত্রাতেই, রেখা বরাবর, সেরকম গোটা হার্ডডিস্কের ভৌত ধারণক্ষমতাটাকে ভেবে নেওয়া হয় পরপর ব্লকের একটা সারি হিশেবে, ডিস্কের ভৌত জ্যামিতিতে আর যাওয়াই হয়না। হার্ডডিস্কের ধারণকে ভাবার এককই হয়ে গেছে সিলিন্ডার, তাই এলবিএ ছকে সাজিয়ে নেওয়া ব্লকটেবিলও সিলিন্ডার দিয়েই দেখায়, কিন্তু, এই এলবিএ আকারে ছকে

ফেলা একটা হার্ডডিস্কের একটা সিলিন্ডারের শুরু বা শেষের সঙ্গে আদত ভৌত হার্ডডিস্কের একটা ভৌত সিলিন্ডারের শুরু বা শেষের কোনো সম্পর্কই নেই। বায়োস রম চিপে যে আদেশগুলো ভরা থাকে, যার কথা আমরা আলোচনা করেছি এক আর দুই নম্বর দিনে, সেই আদেশগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ আদেশস্তর বাড়িয়ে নেওয়া হয়, যার নাম 'INT13H', যাতে সরাসরি বায়োস হার্ডডিস্কটাকে আর ভৌত ডিস্ক হিশেবে না-ভেবে, একটা যৌক্তিক ছকে আবদ্ধ ব্লকের সারি হিশেবে নিতে পারে। এতে হার্ডডিস্কের একটা ভৌত পার্টিশনের ১০২৪ সিলিন্ডারের সীমা, এবং স্মৃতি ধরে রাখার ৫২৮ মেগাবাইটের সীমা অতিক্রম করতে পারা যায়।

১০.২।। পার্টিশন — প্রাথমিক ধারণা

আমরা জানি, একটা হার্ডডিস্ককে ফর্মাট করা মানে কী — তাকে কাঁচা ভৌত চৌম্বক পদার্থের একটা সমাহার থেকে ফাইল তথা ডিরেক্টরিসিস্টেম বানানোর মত জায়গায় নিয়ে আসা। যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমের মত গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমেও একটা হার্ডডিস্ক ব্যবহার করার আগে তাকে ব্যবহারযোগ্যতায় আনতে হয়, মানে ফর্মাটিং করতে হয়। এই ফর্মাটিং করেই অপারেটিং সিস্টেম কাঁচা হার্ডডিস্কটাকে নিজের তথ্য রাখার এবং পড়ার উপযোগী করে তোলে, কোনো ট্র্যাকে ত্রুটি থাকলে সেটাকে চিহ্নিত করে, যাতে পরবর্তী সময়ে তথ্য লেখার বা পড়ার সময়ে তাদের বাদ দিয়ে রাখা যায়। এর প্রাথমিকতম ফর্মাটিং-টা করা অবস্থাতেই আইডিই বা স্কাসি হার্ডডিস্কগুলো আমাদের কাছে আসে। আমরা ফর্মাটিং বলতে সচরাচর যে ক্রিয়াটা করি তার মানে মূলত ফাইলসিস্টেম বানানো। এর প্রথম স্টেপ হল পার্টিশন বানানো বা গোটা হার্ডডিস্কটাকে ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করা। পার্টিশনটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর থেকে সেটাকে অন্য পার্টিশনগুলো থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যাবে, যেন সেটা নিজেই আলাদা একটা হার্ডডিস্ক। ছ-নম্বর দিনের ৬ নম্বর সেকশনের ওই টেবিলটা মনে করুন, যেখানে একই সঙ্গে একই হার্ডডিস্ক '/dev/hda'-তে দুটো পার্টিশন '/dev/hda1' আর '/dev/hda5', সেখানে ফাইলসিস্টেম উইন্ডোজ ফ্যাটথার্টিটু আর '/dev/hda6' হল তিন নম্বর পার্টিশন যেখানে ফাইলসিস্টেম রাইজারএফএস। এবং ভাবুন, দুটো আলাদা অপারেটিং সিস্টেম এদের ডিরেক্টরি এবং ফাইলকাঠামো তৈরি করেছে, প্রথম দুটোর বেলায় উইন্ডোজ আর তৃতীয়টার বেলায় স্ল্যাকওয়ার। এবং যখন কোনো একটা অপারেটিং সিস্টেমে বুট করা হয় তখন উইন্ডোজ তার বুট করার ফাইলগুলোকে তুলে নেয় '/dev/hda1' থেকে আর স্ল্যাকওয়ার তুলে নেয় '/dev/hda6' থেকে। এখানে পরপর তিনটে আলাদা আলাদা স্টেপ খেয়াল করুন। স্টেপ এক, যখন কাঁচা ডিস্ক থেকে তাকে ফাইল সিস্টেম বানানোর জায়গায় আনা হচ্ছে, পার্টিশন বানানো হচ্ছে, সেটা গোটা হার্ডডিস্ককে ব্যবহার করেও করা যেতে পারে, আবার তার একটা অংশকেও করা যেতে পারে, এই উদাহরণের মত। স্টেপ দুই, যেখানে, একটা বিশেষ অপারেটিং সিস্টেম সেই পার্টিশনে নিজের ফাইলসিস্টেম গড়ে তুলছে, এই ফাইলসিস্টেম মানে তার নিজের ডিরেক্টরি হায়েরার্কি এবং সেখানে ফাইলগুলোকে, এবং ফাইল রাখার বন্দোবস্তটাকে। এই কাজটা করা যেতে পারে নানা ধরনের ফাইলসিস্টেম ব্যবহার করে, মানে, ফাইল লেখার এবং রাখার স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায়, যেমন, রাইজারএফএস, এক্সএফএস, ইএক্সটিথ্রি, উইন্ডোজ-ফ্যাটথার্টিটু, ডস-ফ্যাটসিক্সটিন, ইত্যাদি। স্টেপ তিন, এক বা একাধিক পার্টিশনকে মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এক একটা আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেমের এক একটা আলাদা আলাদা ইউনিফায়েড ফাইল সিস্টেম। এতে কখনো, কোনো একটা ঐক্যবদ্ধ সিস্টেমের ক্রমানুসারী বা হায়েরার্কিকাল ফাইলব্যবস্থায় সবগুলো হার্ডডিস্কের সবগুলো পার্টিশনকেই নিয়ে আসা হতে পারে, যেমন আমার মেশিনের সুজে। আবার তা নাও হতে পারে, যেমন, স্ল্যাকওয়ারে, সুজের মূল পার্টিশনটাকে মাউন্ট করা হয়না, সুজে পার্টিশনটায় ফাইল বানানোর ব্যবস্থার নাম এক্সএফএস, যা কাজে লাগাতে গেলে অন্য একটা ড্রাইভার কারনেলে রাখার দরকার পড়ে, স্ল্যাকওয়ারে তা চাইলে করা যায়, আমি ইচ্ছে করেই করিনি, একবার দেখবার জন্যে কয়েকদিনের জন্যে করেছিলাম। কিন্তু এনভিডিয়া, যা আমার মাদারবোর্ড, ইন্টিগ্রেটেড ভিডিও কার্ড সাউন্ড কার্ড সহ, 'A7N266VM', তার ড্রাইভারে কিঞ্চিৎ বেদনা আছে, ঠিক ভাবে কারনেলে কম্পাইল হতে চায়না, অনেক অ্যাডজাস্ট করতে হয়, সুজে যেটা নিজেই করে দেয় — স্ল্যাকওয়ার একবার ব্যবহার করে দেখুন, ভারি মজা, প্রতিটি কনফিগারেশন আর অ্যাডজাস্টমেন্ট একদম নিজে হাতে ফাইল লিখে লিখে করতে হয়। আবার উইন্ডোজ যে ফাইলসিস্টেম দেখতে পায়, এবং ব্যবহার করে শুধু ফ্যাটথার্টিটু পার্টিশনদুটো, অন্য কোনো লিনাক্স পার্টিশন উইন্ডোজ ফাইলসিস্টেমে ঢোকেনা। একটা ইউনিফায়েড ফাইলসিস্টেমের সমগ্রে কোন কোন পার্টিশন কী ভাবে ঢুকবে, আমরা একটু বলেছি তাই নিয়ে, পরে মাউন্টের প্রসঙ্গে আরো আসবে — এটা নির্ভর

করে আমার ইচ্ছে এবং আমার অপারেটিং সিস্টেমের কারনেলের উপর, এইমাত্রই তো দেখলেন স্ল্যাকওয়ারের কারনেলের প্রসঙ্গে।

পার্টিশন কী বারবার তার উদাহরণ দেখেছি আমরা, এবার এর সংজ্ঞাটা নিয়ে একটু ভাবা যাক। একটা ভৌত হার্ডডিস্ককে যখন আমরা একাধিক লজিকাল টুকরোয় ভেঙে নিচ্ছি, তার এক একটাকে ডাকছি পার্টিশন বলে। লজিকাল বলতে যৌক্তিক এই অর্থে যে অপারেটিং সিস্টেমের একটা আস্ত অটুট হার্ডডিস্কের সঙ্গে কাজ করার যে যুক্তি বা লজিক সেটা এবার চালু থাকবে ওই পার্টিশনগুলোর উপরেও। মানে তাদের ভৌত একতাকে নিয়েই তারা এখন যৌক্তিক ভাবে অনেক হার্ডডিস্ক হয়ে উঠবে। একটা পার্টিশন তৈরি হয় কন্টিগুয়াস ব্লকদের নিয়ে। ব্লক মানে যে একক দিয়ে একটা হার্ডডিস্কের তথ্য রাখার সামর্থ্যকে মাপছি আমরা, সেই গোড়া থেকেই। এই ব্লকগুলোকে হতে হবে কন্টিগুয়াস বা একত্রে সম্বদ্ধ, মানে একই জায়গায়। একটা হার্ডডিস্কের এখানে কিছু ব্লক, ওখানে কিছু ব্লক, তাদের নিয়ে পার্টিশন তৈরি করা যায়না। এই একত্রে সম্বদ্ধ ব্লকগুলোকে মিলিয়ে তৈরি পার্টিশনটাকে অপারেটিং সিস্টেম একটা স্বতন্ত্র হার্ডডিস্ক হিশেবে গণ্য করে। হার্ডডিস্কের কোন অংশকে নিয়ে, কোন কোন ব্লক নিয়ে, একটা পার্টিশন তৈরি হচ্ছে, তার খুঁটিনাটিগুলো লেখা থাকে পার্টিশন টেবিলে।

আমরা একাধিক পার্টিশন করি, করতে হয় আমাদের, এর একটা বড় কারণ হল তথ্যের নিরাপত্তা, আগেই তো বলেছি, উইন্ডোজে থাকাকালীন, যখন ভাইরাসের ভয়ে কুঁকড়ে থাকতে হত সবসময়, কোনো বন্ধু কোনো মেল অ্যাটাচমেন্ট পাঠালেও খোলার আগে দিন দশেক ফেলে রাখতাম, যদি কোনো নতুন ভাইরাস থাকে, তাহলে তার ভাইরাস নিধক আপডেট বেরিয়ে যাওয়ার সময়টা দিতে, সবচেয়ে বেশি ভাইরাস তো আসে ওই অ্যাটাচমেন্টগুলো থেকেই, আরো যদি এমএসওয়ার্ড ফাইল অ্যাটাচমেন্ট হয়, তার মধ্যেকার মাইক্রোগুলোয় — ওইসময় তো বলেছি, একটা বাড়তি পার্টিশন রাখতেই হত, একটার অত্যাবশ্যক তথ্য অন্যটায় চালান করে দাও, তারপর গোটা ড্রাইভটা ফরম্যাট করে ফেলো। শুধু এই ভাইরাসভীতি নয়, ধরুন অন্য কোনো কেলোও যদি ঘটে একটা পার্টিশনে, হঠাৎ করে রাশিরাশি ব্যাড সেক্টর এসে সব ঘেঁটে গেল, তখন অন্য পার্টিশনটায় রাখা ফাইলগুলো বেঁচে যাবে। সেইজন্যে রেগুলার মূল কাজের পার্টিশনটার জরুরি ফাইলগুলোর ব্যাকআপ নিতে হয় অন্য আর একটা পার্টিশনে। আমার দুটো হার্ডডিস্কেরই জরুরি ফাইলগুলো একটা হার্ডডিস্কের থেকে অন্যটার কোনো পার্টিশনে ব্যাকআপ করার জন্যে একটা শেল-স্ক্রিপ্ট বানিয়ে রেখেছি, এক দিন দু দিন অন্তর অন্তর সেটা চালিয়ে দিয়ে চলে যাই, শেষ লাইন 'poweroff', ও নিজেই কাজ শেষ হলে মেশিন অফ করে দেয়।

পার্টিশন বাড়ানোর আর একটা কারণ হার্ডডিস্কের জায়গা আরো ভালো করে ব্যবহার করতে পারা। এটা খুব দরকার পড়ে যাদের অনেক ছোট ছোট সাইজের ফাইল ব্যবহার করতে হয়, যেমন বড় বড় নেটওয়ার্ক মেশিনগুলোয়, কোটি কোটি কুকি থাকে — বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পরিচয়পত্র, সেইসব ফাইলগুলো খুব গুড়িগুড়ি সাইজের হয়। এবার তাদের জন্যে যদি ব্লক সাইজ স্বাভাবিক চার কিলোবাইটের মাপেই রাখা হয় তাহলে প্রতিটা ওই জীবানু সাইজের ফাইলের জন্যেই নষ্ট হতে থাকে চার কিলোবাইট করে জায়গা, কারণ, একটা ব্লকে একটার বেশি ফাইল রাখেনা সিস্টেম। এই জন্যে ওই ছোট ছোট ফাইল ব্যবহারের বিশেষ পার্টিশন বানানো যায় যাদের ব্লক সাইজ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম।

অনেকসময় পার্টিশন বানাতে হয় খুব বেশি কমপ্ল্যান বা হরলিকস খাওয়া ব্যবহারকারীদের শায়েস্তা রাখার জন্যেও। ধরুন হার্ডডিস্কের পাঁচ গিগাবাইট ভূমি আছে সেই পার্টিশনে যেখানে আমার সিস্টেমের '/home' ডিরেক্টরি। আগেই তো বলেছি, গ্নু-লিনাক্সে আলাদা আলাদা ডিরেক্টরি আলাদা আলাদা পার্টিশনে মাউন্ট করার ব্যবস্থা করা যায়। আগেই দেখিয়েছি, '/home' ডিরেক্টরির মধ্যে চারটে সাবডিরেক্টরি আছে, '/home/atithi', '/home/dd', '/home/manu', আর '/home/piu'। এবার ধরুন 'piu' নামের ওই ইউজার ও ভুলভাল সব ফাইল এনে এনে, গানের কিম্বা সিনেমার বা অঙ্কের গাবদা গাবদা সব ডায়াগ্রাম, ভরেই চলেছে নিজের হোম মানে '/home/piu' ডিরেক্টরিতে। ফাইলগুলো ভুলভাল, বুঝতেই পারছেন, ইউজার 'dd' আনলে যা হতনা। এবার, '/home/piu' বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় চলে এল যে অন্য ইউজারদের আর সাধারণ ফাইলগুলো লেখার জায়গাটুকুও রইলনা। এধরনের বেআক্কেলে ব্যবহার সামলানোর একটা সহজ উপায় হল '/home/piu' ডিরেক্টরির জন্যে একটা আলাদা পার্টিশন করে দেওয়া, ধরুন পাঁচ গিগাবাইটের চার ভাগের এক ভাগ মানে সোয়া এক জিবি সাইজের। এবং পষ্ট বলে দেওয়া, নে,

এবার কী করবি কর, তোর জায়গা মোট এত, যা রাখতে পারিস রাখ। এখনো করিনি এটা, আমার মত উদার লোক আর হয়না বলে।

একখানা আসমুদ্রহিমাচল পার্টিশনের জায়গায় বাংলা বিহার উড়িষ্যা টাইপের ছোট ছোট পার্টিশনে ফাইল অনেক কম টুকরো হয়, যাকে বলে ফ্র্যাগমেন্টেশন। ফ্রাগমেন্টেশন বাড়লে ডিস্ক থেকে ফাইল পড়ার বা ডিস্কে ফাইল লেখার সময় বেড়ে যায়, মানে সিস্টেম শ্লথ হয়ে পড়ে। এই সমস্যাটা অবশ্য ফ্যাটথার্টিটুতে যে ধরনের, গ্নু-লিনাক্সের ফাইলসিস্টেমগুলোয়, রাইজার বা এক্স বা ইএক্সটিথ্রি, আদৌ সেটা নয়, পরে দেখবেন। আর, একাধিক পার্টিশনের একটা জরুরত তো আগেই বলেছি, একাধিক অপারেটিং সিস্টেম রাখা। আমার সুজে স্ল্যাকওয়ার আর উইন্ডোজ এই তিনটে অপারেটিং সিস্টেমের জন্যে অন্তত তিন পিস পার্টিশন তো লাগবেই।

পার্টিশন এরকম বাড়িয়েই তোলা যায়, শুধু মাথায় রাখতে হয়, পার্টিশন বানানোর সময় একটার জন্যে ঘোষিত ভূমি যেন অন্যটার মধ্যে না ঢুকে যায়, পার্টিশন বানানো বদলানো বা নাড়াচাড়ার জন্যে যে সফটওয়ার প্যাকেজগুলো থাকে, যেমন 'fdisk', 'cfdisk', 'sfdisk', 'parted' ইত্যাদি, সেগুলোয় এটা হওয়ার কথাও নয়, তবে একাধিক সফটওয়ার দিয়ে আলাদা আলাদা সময়ে পার্টিশনগুলোর আকারআকৃতি বদলালে কখনো কখনো সমস্যা আসতে দেখেছি। এগুলো সবই ফ্রি সফটওয়ার, 'parted' তো গ্নু-র। 'cfdisk' তো আবার পিছনে 'fdisk'-কেই ব্যবহার করে, এনকার্সেস ব্যবহার করে ছবিতে দেখায় কনসোলেই। আমার দু একবার সমস্যা হয়েছে বাণিজ্যিক সফটওয়ার পার্টিশন-ম্যাজিক আর 'fdisk'-এর মধ্যে। তবে 'sfdisk' সত্যিই খুব জাঁদরেল, একটু বেশি ক্রিপ্টিক বা সাঙ্কেতিক যদিও, একটু বেশি ভালো করে ম্যানপেজ পড়ে নিতে হয়। আর অনেক ডিস্ট্রিবিউশনের ভিতরে নিজেদের অনেক প্যাকেজ দেওয়া থাকে যা দিয়ে পার্টিশনগুলোর সাইজ বাড়ানো কমানো যায়, কখনো কপিও করা যায়, তবে সেসব বেশি না-করাই ভালো। আপনি এই প্যাকেজগুলোর যেটাই ব্যবহার করুন আগে বার তিনেক গোটা ম্যানপেজ পড়ে নেবেন, নয়তো ঘেঁটে ফেলাটা অবশ্যম্ভাবী, আর পাকস্থলীতে র টাইটানিয়াম না-থাকলে ম্যানপেজ এক বারে হজম করা যায়না, এবং তথ্য হিশেবে বলে রাখি, একমাত্র আইনস্টাইন ছাড়া আর কারুর ভিসেরায়, এখনো, টাইটেনিয়াম পাওয়া যায়নি।

আমরা ম্যান আর ইনফো নিয়ে কথা বলেছি আগে। এখন আর একটু এগোনোর সময় এসেছে — এবার সিস্টেম হাউটু পড়ার সময় এসেছে, যে ডিস্ট্রিবিউশন আপনি ব্যবহার করছেন তাতে হাউটু-গুলো কোথায় আছে দেখে নিন। খোঁজার একটা সহজ কমান্ড আছে 'whereis', এছাড়া 'find' তো আছেই। 'find' ব্যবহারের অপশানগুলো আগে শিখে নিন ম্যানপেজ পড়ে। যেমন, যদি আপনি কমান্ড দেন, '`find / -name howto`' — এর মানে গোটা '/' ডিরেক্টরির সমস্ত সাবডিরেক্টরি বেয়ে সার্চটা ও করবে, কোথায় কোন ফাইল বা ডিরেক্টরির নামে 'howto' শব্দটা আছে। এখানে আপনি রেগুলার এক্সপ্রেশনও দিতে পারেন। ধরুন '*howto*' ইত্যাদি। এই 'find' কমান্ডটা কাজ করে বাস্তব ডিরেক্টরিতে নেমে নেমে বাস্তব ফাইলগুলোকে খুঁজে খুঁজে, তাই সময় একটু বেশি লাগে। 'find'-এর চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করে 'locate'। 'locate' বাস্তব ফাইল বা ডিরেক্টরিগুলো খোঁজে না, খোঁজে একটা ডেটাবেস। সেই ডেটাবেসটা আগে বানিয়ে নিতে হয় 'updatedb' কমান্ড দিয়ে। এই কমান্ডটা দিতে গেলে রুট হয়ে নিতে হয়। আপনি যদি অন্য কোনো ইউজার হয়ে ঢুকে থাকেন তাহলে 'su' কমান্ড দিন। তখন ও রুট পাসওয়ার্ড চাইবে, পাসওয়ার্ড দিয়ে দেওয়ার পর 'updatedb' কমান্ডটা কাজ করবে। ডেটাবেসটা তৈরি হতে কিন্তু বেশ একটু সময় লাগে। যদি অন্য কাজের তাড়া থাকে তাহলে কাজটা করুন ব্যাকগ্রাউন্ডে। '`updatedb &`' দিলে ও কাজটাকে পিছনে গোপনে গোপনে করতেই থাকবে, আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না। 'Ctrl-F1' থেকে 'Ctrl-F6' টিপে অন্য কোনো ভৌতিক টার্মিনাল বা 'tty'-তে গিয়েও কাজটা করতে পারেন, ভৌতিক বা ভার্চুয়াল টার্মিনালের কথা মনে আছে? আর এই ডেটাবেস আপডেট করার কাজটা বেশ রসদকাঙ্খী, সিপিইউ-র উপর চাপ ফেলে, তাই ব্যাকগ্রাউন্ডে হওয়ার সময় অন্য কাজকে ডিস্টার্ব করতে পারে। যদি চান যে এই কাজটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলুক এবং আপনার অন্য কাজের সঙ্গে খুব ভালোমানুষের মত নাইসলি ব্যবহার করুক, তাদের কাজকে শ্লথ না-করে, না আটকে-রেখে, তাহলে কমান্ড দিন '`nice -19 updatedb &`'। এবার, ডেটাবেস তো তৈরি হয়ে গেল, হাউটু খুঁজবেন কী করে? কমান্ড দিন '`locate howto`'। সাবধান, আবার সেই রাশি রাশি লাইন হুড়হুড় করে নেমে যাচ্ছে পলক ঝপকতে। তার জন্যে কী করার আগেই তো বলেছি, এক হল লেস দিয়ে একটু একটু করে পড়া, বা রিডাইরেক্ট করে একটা ফাইল বানানো, সেটাকে পড়া, খুঁজে দেখা। খোঁজার কমান্ড 'grep' মনে আছে তো? এবার এই গোটা প্যারাগ্রাফে নতুন নতুন যে

জিনিষ এলো, চারটে এসেছে, এদের আপনি ম্যান বা ইনফো দিয়ে জেনে নিন। শুধু ওই '৪' ব্যাপারটা পাবেন ব্যাশে, বা ব্যাশ-স্ক্রিপ্টিং নিয়ে হাউটুতে, যে হাউটু খোঁজার জন্যে আমরা ডেটাবেস আপডেট করলাম। কোনো কোনো ডিস্ট্রিবিউশনে সমস্ত লিনাক্স হাউটু একসাথে, যা টোটাল-হাউটু নামে পরিচিত, সেটা দেওয়া থাকে, যেমন সুজে বা ম্যানড্রেক। সুজেতে এর পাথটা হল '/usr/share/doc/howto/en/html/'। ম্যানড্রেকে যদ্দূর মনে হচ্ছে হাউটুর বানানটা ক্যাপিটাল কেসে। কোনো কোনোটায় প্যাকেজ ভিত্তিক হাউটু দেওয়া থাকে, মোটটা থাকেনা, সেইরকম অবস্থায় আপনি এটা নামিয়ে নিন 'www.tldp.org' বা 'www.linuxdocs.org' বা এফটিপি করে নামিয়ে নিন, 'anonymous' হয়ে, 'ftp://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO' থেকে। 'tar.bz2' করা যে ফাইলটা সেটা সবচেয়ে সাইজে ছোট হয়। আমরা যারা ডায়ালআপ কানেকশনে কাজ করি তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। ফাইলনামের এক্সটেনশন 'tar.bz2' মানে কোঁকড়ানো সিন্দুক, এর থেকে ভেঙে মূল ফাইলগুলো বার করার কমান্ড হল 'tar xvjf', তবে তার আগে একটু . . . *খেজুরগাছে* . . . গেয়ে নেওয়া ভালো। এই হাউটুর মোট ভাণ্ডারটা রোজই বাড়ছে এবং বদলাচ্ছে, আমার কাছে শেষ যেটা নামানো আছে তাতে চারশো উনসত্তরটা হাউটু আছে। পিডিএফ বা ডকুমেন্ট ফাইলে বদলে নিলে যার বেশিরভাগেরই আকার 'A4' পঞ্চাশ পাতারও বেশি। আপনি বুঝতে পারছেন, সিস্টেম কত দূর অব্দি তার সকল নিয়ে বসে আছে সর্বত্যাগের আশায় — আপনাকে দিয়ে উজাড় হবে বলে। ভেবে নিন তাকে ভিখারি বানানোর মত আপনি যথেষ্ট গৌরী তো? এই হাউটুতেই আপনি পেয়ে যাবেন, এইমাত্র যে 'tar' আর 'bzip2'-র কথা বললাম, বা যে প্রসঙ্গে আমাদের আসা এই হাউটু-র কথায় — মানে হার্ডডিস্কের পার্টিশন নিয়ে নাড়াচাড়া, আপনি এই হার্ডডিস্ক আর পার্টিশন নিয়েই পাবেন চোদ্দখানা হাউটু। এর পরেও আপনার হার্ডডিস্ক এবং কারনেলের সম্পর্কের ডিটেইলস যদি জানতে চান তাহলে একটা ভারি ভাল উৎস হল আপনার সিস্টেমের ভিতরেই থাকা '/usr/src/linux/Documentation/'। এর মধ্যে দেখুন, আইডিই এবং স্কাসি সম্পর্কে দুটো আলাদা ডকুমেন্ট দেওয়া আছে। আর সামগ্রিক ভাবে ডিভাইস নিয়েও আছে। এবার ফেরত যাওয়া যাক পার্টিশনের কথায়।

১০.৩।। পার্টিশনের রকমফের

আগেই বলেছি আমরা একটা পার্টিশনে কেবল একরকমের ফাইলব্যবস্থা থাকতে পারে। সেই ফাইল লেখা পড়া ও রাখার সিস্টেম ইএক্সটিথ্রি হোক, রাইজারএফএস হোক, এক্সএফএস হোক, বা সোয়াপ পার্টিশনের নিজস্ব সোয়াপ ফাইল ব্যবস্থা হোক। বা গ্নু-লিনাক্স-এর বাইরের যেসব ফাইল ব্যবস্থার পার্টিশনকে মাউন্ট করে নেওয়া যায় কোনো ডিরেক্টরিতে, সেই মাইক্রোসফটের ফ্যাটথার্টিটু বা এনটিএফএস বা সান মাইক্রোসিস্টেমের ইউএফএস হোক, বা এরকম আর কিছু। প্রত্যেক ধরনের পার্টিশনের নিজের একটা কোড থাকে। যেমন ইএক্সটিটু পার্টিশনের কোড '0x83', সোয়াপ পার্টিশনের কোড '0x82', ইত্যাদি। কোন পার্টিশনের কী কোড এটা জানার সহজ উপায় হল 'fdisk'-এ ঢুকে 'l' মারা মানে পার্টিশন কোডের লিস্ট দেখাতে বলা।

হার্ডডিস্ককে কটা পার্টিশনে ভাঙা যাবে, ইন্টেল বা ইন্টেল ধাঁচে নির্মিত মেশিনের বেলায়, এর একটা সীমা গোড়া থেকেই ছিল, মূল পার্টিশন টেবিলটা লেখা হত হার্ডডিস্কের বুট সেক্টরে এবং তাতে জায়গা ছিল মাত্র চারটে পার্টিশনের নাম লেখার। এই ধরনের প্রাথমিক পার্টিশনকে বলে প্রাইমারি পার্টিশন। এদের সংখ্যা হতে পারে সর্বোচ্চ চার। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই কটা পার্টিশনে কুলোনো সম্ভব না-হলে তখন পার্টিশন বাড়াব কী করে? তার জন্যে এল লজিকাল বা যৌক্তিক পার্টিশন। যেখানে একটা ওই চারটে প্রাথমিক ভৌত প্রাইমারি পার্টিশনের কোনো একটাকে আবার ভেঙে ফেলা হচ্ছে কতকগুলো ছোটতর পার্টিশনে। তাদের আমরা ডাকছি লজিকাল পার্টিশন বলে। এতে করে ওই চার পার্টিশনের সীমাটাকে ভাঙা গেল। যে প্রাইমারি পার্টিশনের মধ্যে এবার আমি ছানা পার্টিশনগুলোকে গজাচ্ছি, তাকে এখন ডাকব এক্সটেন্ডেড বা পরিবর্দ্ধিত পার্টিশন বলে। এর আলাদা করে কোনো ফাইল ব্যবস্থা থাকেনা, কোনো ফাইলও, এই এক্সটেন্ডেড পার্টিশন ধরে রাখে এর ভিতরের লজিকাল পার্টিশনগুলোকে। এই ধরনের পার্টিশনের কোড হল '0x05'। এখানে লজিকাল পার্টিশন আর প্রাইমারি পার্টিশনের আর একটা তফাত বলে রাখা ভাল। মূল হার্ডডিস্কে কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিকে আমি চাইলে ছেড়েও রাখতে পারি, কোনো পার্টিশন না বানিয়ে, পরে বানাব প্রয়োজনমত। তাই প্রাইমারি পার্টিশনগুলোকে যে কন্টিগুয়াস বা পরপর সংলগ্ন হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যতা নেই। কিন্তু একটা এক্সটেন্ডেড পার্টিশনের মধ্যে লজিকাল পার্টিশনগুলোকে ঠিক পরপর বা কন্টিগুয়াস হতেই হবে। প্রত্যেকটা লজিকাল পার্টিশনের মধ্যেই পরবর্তী লজিকাল পার্টিশনের একটা পয়েন্টার বা চিহ্নক থাকে। এই করে

পরপর অনন্ত সংখ্যক লজিকাল পার্টিশন থাকতে পারে। কিন্তু গ্নু-লিনাক্সের নিজস্ব কিছু নিষেধ আছে এখানে, একটা স্কাসি হার্ডডিস্কে গ্নু-লিনাক্সে মোট পার্টিশন থাকতে পারে পনেরোটা অব্দি, আর আইডিই হার্ডডিস্কে থাকতে পারে তেষট্টিটা অব্দি।

প্রাথমিক ফাইলসিস্টেম পার্টিশনগুলো ছাড়া অন্য যে পার্টিশন থাকে সেটা হল সোয়াপ পার্টিশন, সোয়াপ ফাইল লেখার জন্যেই তুলে রাখা জমিজিরেত, এক কথায় সোয়াপস্পেস বা পরিবর্তভূমি। এক আর দুই নম্বর দিনের আলোচনাগুলো মনে করুন — কম্পিউটারে যখনি আমি কোনো প্রোগ্রাম চালাচ্ছি, একটা প্রসেস চালু হচ্ছে, আর এই প্রসেসের জন্যে কম্পিউটারের সিপিইউ ধার্য করে দিচ্ছে র‍্যাম ব্লকের একটা নম্বর, ঠিক যেভাবে আমরা দেখিয়েছি দুই নম্বর দিনে, যে ব্লক গুলোকে ডাকা হয় পেজ বা স্মৃতির পাতা বলে, আগেই বলেছি। এই পাতায় যে কোডটা তুলে ফেলা হয়, সেটা খুব আশু ভবিষ্যতেই কাজে লাগবে সিপিইউ-র। সিপিইউ-র ভিতরকার রেজিস্টারগুলোকে কাজে লাগিয়ে সিপিইউ সেখানে বারবার পড়বে আর লিখবে, এক নম্বর দিনের আলোচনায় দেখিয়েছি আমরা। এই কোডগুলোকে ডাকা হয় 'ওয়ার্কিং সেট' নামে, সত্যিই তো ওগুলো ভারি কাজের জিনিষ। গ্নু-লিনাক্স ধরে নেয় যে সদ্য কাজে লাগানো জিনিষগুলো আবার শিগ্গিরি কাজে লাগবে, তাই তাদের র‍্যাম মেমরির কোড-পেজে তুলে ফেলে। কিন্তু যদি একইসঙ্গে অনেকগুলো প্রসেস চলতে থাকে — মাল্টিপ্লেক্সিং-এর কথা মনে আছে? অনেকগুলো প্রসেস একত্রে চলাকালীন কারনেল চেষ্টা করে র‍্যামকে যথাসাধ্য মুক্ত করে তুলতে, যাতে পরপর একের পর এক কাজকে সে র‍্যামে নিয়ে আসতে পারে। এই র‍্যামের ভার লাঘব করার জন্যেই থাকে সোয়াপ ফাইল, আগেই বলেছি। কাজের দিক থেকে বলতে গেলে, র‍্যামকে আসলে বাড়িয়ে তোলে সোয়াপ স্পেস বা পরিবর্ত ভূমি, র‍্যামের পরিবর্তে এই ভূমিতেই অস্থায়ী ভাবে লেখা হয় র‍্যামের ওই কোডপেজগুলো। যদিও এখানে সবচেয়ে বড় গ্যাঁড়াকলটা হল আইও, ইনপুট/আউটপুট। এই 'আইও' লিখতে গেলেই আমার মনে হয় আমাদের জিএলটির সেই সভ্যের কথা যে মুহূর্মুহু 'আইও আইও' করে, কিন্তু এই লেখাটার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই, কারণ বাংলাই জানেনা, দাঁড়ান, ওর পুরো নামটা এখানে লিখে দি, যাতে পড়তে গিয়ে আপনাকে অন্তত একবার 'আইও' বলে উঠতেই হয় — পোনথিরানাভকারাসু বিশালাকষ্মি মুরুগেশন, আমরা ডাকি আরাসু বলে। যাইহোক এই ইনপুট আউটপুটের শ্লথতাই এই র‍্যামপেজ সোয়াপফাইলে বারংবার প্রয়োজনমত লিখে ফেলার এবং পরে যখনই কাজ পড়বে পড়ে ফেলার ব্যাপারে একমাত্র বাধা। র‍্যামে কোনো কিছু লেখা যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় করতে পারে সিপিইউ সেটা কখনোই হার্ডডিস্কে সোয়াপ ফাইলের বেলায় সম্ভব নয়, তাই সোয়াপ ফাইল র‍্যামকে বাড়িয়ে তোলে বটে, কিন্তু র‍্যামের তুলনায় বড্ড বেশি ধীরে কাজ করে। অনেক প্রসেসের ভিতর অনেক ভাগে ভাগ হতে হতে মেমরি যখন লম্ফর টিমটিমে হলুদ আগুনের মত কোনোক্রমে মরে না গিয়ে বেঁচে থাকার মত পরিমাণের হয়ে পড়ে, তখন কারনেলকে বাধ্য হয়ে একটা প্রসেসের কাজের জিনিষ মানে ওয়ার্কিং সেটের কোড-পাতাগুলো সরিয়ে ফেলতে হয়, আর একটা প্রসেসের ওয়ার্কিং সেট মেমরি পাতায় তোলার আগে। সরিয়ে নিয়ে রাখে ওই সোয়াপ ফাইলে। একে বলে থ্র্যাশিং, মানে এক অর্থে কেলিয়ে বার করে দেওয়া। কিন্তু আগেই তো বলেছি বারবার, সিপিইউ আর র‍্যামের হটলাইন বেয়ে তথ্য যে স্পিডে লেখা-পড়া হয়, তার ধারেকাছেও আসেনা সোয়াপফাইলের হার্ডডিস্কের আইও। তাই, যতই সোয়াপফাইল র‍্যামকে বাড়িয়ে তুলুক, পর্যাপ্ত র‍্যাম ইজ পর্যাপ্ত র‍্যাম, তার জায়গা কদাচ সোয়াপ ফাইল নিতে পারেনা। গ্নু-লিনাক্সে সচরাচর র‍্যাম আর সোয়াপ ফাইল যোগ করে ভারচুয়াল বা ভৌতিক মেমরির আকার ধরা হয়। তার মানে ধরুন যদি দুশোছাপ্পান্ন মেগাবাইট র‍্যাম হয়, আর পাঁচশো চল্লিশ মেগাবাইট সোয়াপস্পেস রাখা হয়, তাহলে ভৌতিক স্মৃতির আকার দাঁড়াচ্ছে সাতশো ছিয়ানবব্ই এমবি। সচরাচর ধরে নেওয়া হয় যে র‍্যাম যা হবে তার দ্বিগুণ হওয়া উচিত সোয়াপ স্পেস। র‍্যাম খুব বেশি বা খুব কম হলে এই হিশেবটা নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। তবে এই হিশেবটারও আভ্যন্তরীন যুক্তি কী আমি জানিনা, তবে চলে কথাটা, এবং আমিও মোটামুটি মেনে চলি।

এবার প্রশ্ন ওঠে ঠিক কী কী রকমের কটা পার্টিশন আমার লাগবে। আমরা আগেই যা বলেছি, মাস্টার বুট রেকর্ড বা এমবিআরটা লেখা থাকে হার্ডডিস্কের একদম প্রথমতম ভূমিটায়। এই মাস্টার বুট রেকর্ডকে লজিকাল পার্টিশনে লেখা যায়না, তাই যদি আমরা ওই হার্ডডিস্ক থেকে একটাও অপারেটিং সিস্টেম বুট করতে চাই, তাহলে অন্তত একটা প্রাইমারি পার্টিশন লাগবেই। ওই হার্ডডিস্ক থেকে বুট করতে চাইলে শুধু একটা প্রাইমারি পার্টিশন থাকতে হবে তাই নয়, আরো থাকতে হবে একটা বা একাধিক সোয়াপ পার্টিশন। এবং এর সঙ্গে ইচ্ছে হলে প্রয়োজন হলে লজিকাল

পার্টিশন থাকতেই পারে, এর কোনো শর্ত নেই। আর, সেই ড্রাইভ থেকে যদি বুট করা না হয় তাহলে সেটা গোটাটা একটা পার্টিশন না একাধিক পার্টিশন, পার্টিশনটা প্রাইমারি না লজিকাল না সোয়াপ তার কোনোটারই কোনো শর্ত নেই। এর পরেও কিছু কথা আছে যেগুলো সেই অর্থে বাধ্যতামূলক না হলেও মেনে চলাটাই প্রথা। যেমন ধরুন আপনার '/boot' ডিরেক্টরিটা যে পার্টিশনে মাউন্ট হয়, মানে আপনার বুট পার্টিশন, যেখান থেকে সিস্টেম বুট করার সময় তার কারনেল এবং কারনেল সংক্রান্ত ফাইল পত্তর পড়ে, সেই পার্টিশনটাও প্রাইমারি পার্টিশন করাটাই প্রথা, এতে কোনো মেজর ঘাপলা ঘটলে পরিস্থিতিটা সামলানো সহজ হয়। আমি নিজেও এটা সবজায়গায় মানিনি, অন্তত শখানেক জায়গায়, নিজেরটা ছাড়াও ইনস্টলেশন করেছি তো বটেই, এদের অনেকগুলোতেই অনেক বিচিত্র কনফিগারেশন বহুসময় বাধ্যতামূলক ভাবে, করতে হয়েছে, সেসব বললে বিশুদ্ধতাবাদী লিনাক্সীরা বাড়ি এসে আমায় কেলিয়ে যাবে। তারা তো প্রায় সবসময়ই বলে এই পার্টিশনটাকে ইক্সটিটু পার্টিশন করতে, কিন্তু আমার নিজের সিস্টেমে তো গোড়া থেকেই, যখন ম্যানড্রেক করতাম, এখন সুজেতেও, বুট পার্টিশনটা সবসময়েই এক্সএফএস, যা সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে পরিচিত। এখনো কোনো মেজর কেলো ঘটেনি। তবে, যারা বহুব্যবহারকারীর মেইনফ্রেম সিস্টেম চালায়, বহু ধরনের জটিলতা, তাদের তো মাইনর কেলো বলেই কিছু নেই, কেলো মানেই মেজর। তারা এসব ছ্যাবলামি করার সাহস পায়না। আমার আর কী, অন্য হার্ডডিস্কে ব্যাকআপ আছে, ঘেঁটে গেছে তো ভি আচ্ছা, রিইনস্টল করে নাও কাকা। আর গোটা '/home' ডিরেক্টরিটাই টার-বিজেডটু করা থাকে। জাস্ট আনটার করো, এবং ফের হুবহু আগের মত। তারপরে আর একটা প্রথা আছে, সেটা লিলোর। অন্য কোনো বুটলোডার যদি কেউ ব্যবহার করে, যেমন গ্রাব, বা কোনো থার্ড পার্টি প্যাকেজ, তাহলে সেটা প্রযোজ্য নয়। লিলো দিয়ে বুট করলে বুট পার্টিশনটা প্রথম ১০২৪ সিলিন্ডারের মধ্যে রাখাই প্রথা। অনেকসময়ই তা হয়না, আলতো একটু বকে দেয় সিস্টেম, কোনো গন্ডগোল ঘটতে তো দেখিনি তেমন। ভালো না, এসব ভালো না, বলেছেন শাক্যমুনি, চলো ভালো হই, জমকালো হই, বড়দার বাতেলা শুনি।

এবার দেখুন তো, আমার মেশিনের হার্ডডিস্কের পার্টিশনগুলোর খুঁটিনাটি, যেটা পাওয়া যায়, '`fdisk -l`' করে, যে তালিকাটাকে বেশ অনেকটা ছাঁটকাট করে ছয় নম্বর দিনের ছয় নম্বর সেকশনে দিয়েছিলাম, এখন সেটা পুরোটা পড়ে বোঝার মত আলোচনা আমাদের হয়েছে, দেখুন তো আপনি বুঝতে পারেন কিনা। ওইখানে দেওয়া তালিকাটায় আমি সরাসরি এক্সটেনডেড পার্টিশনের লাইনদুটো উড়িয়ে দিয়েছিলাম, আর ডিস্ক, সিলিন্ডার, ব্লক আর ট্র্যাকের খুঁটিনাটিগুলো দিইনি। শুরুর সিলিন্ডার নম্বর, শেষের সিলিন্ডার নম্বর দিইনি, ব্লকের সংখ্যা দিইনি। এবং বোঝার সুবিধের জন্যে জুড়ে দিয়েছিলাম মাউন্টপয়েন্টগুলো। দেখুন তো এবার গোটাটা বুঝতে পারেন কিনা? একটু আধটু অসুবিধায় একটু খেজুরগাছে চড়তে পারেন।

```
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40060403712 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *         1      1020   8193118+   b  Win95 FAT32
/dev/hda2          1021      4870  30925125    f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5          1021      2448  11470378+   b  Win95 FAT32
/dev/hda6          2449      4870  19454652   83  Linux

Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40060403712 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hdb1   *         1        13    104391   83  Linux
/dev/hdb2            14        71    465885   82  Linux swap
/dev/hdb3            72      1508  11542702+  83  Linux
/dev/hdb4          1509      4870  27005265    5  Extended
/dev/hdb5          1509      4870  27005170   83  Linux
```

এই গোটা তালিকাটাকে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ুন, আগের দিনের মানে ছ নম্বর দিনের ছ নম্বর সেকশনে দেওয়া পার্টিশনের তালিকাটার সঙ্গে। দেখুন তো দুটো টেবিলকে মেলাতে পারছেন কিনা? শুধু একটা জিনিষ বলুন তো, ছ নম্বর দিনের ছ নম্বর সেকশনের ওই তালিকায়, '/dev/hda1'-এর পরেই কেন '/dev/had5', আর '/dev/hdb3'-এর পরেই কেন '/dev/hdb5', সেটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? না-পেরে থাকলে আগের সেকশনটা আরো একবার পড়ুন। এই প্রশ্নটা প্রথম প্রথম গ্নু-লিনাক্সে আসা অনেকেই করে।
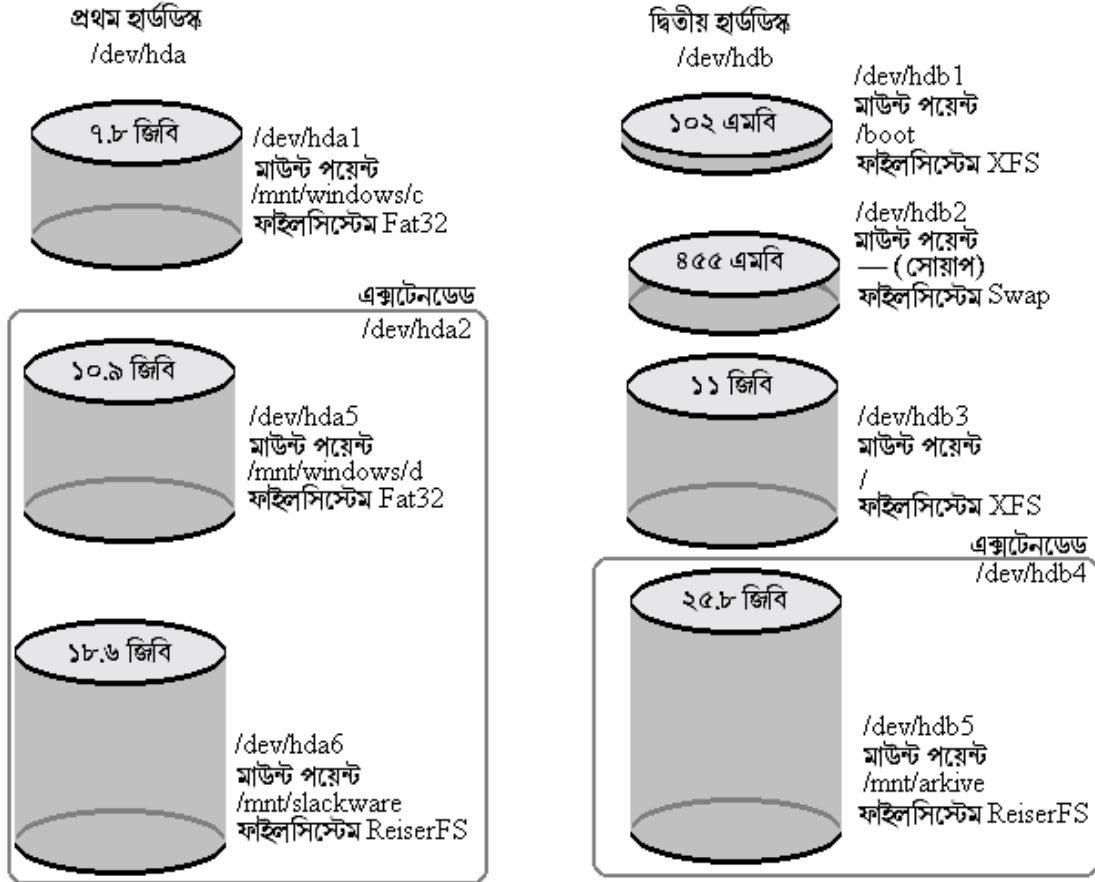
এবার আমার হার্ডডিস্কের পার্টিশনগুলোর একটা ছক ছবিতে দিই, দেখুন তাতে আপনার বুঝতে একটু সুবিধে হয় কিনা। একটু আগের তালিকাটা আর আগের দিনের তালিকাটাকে মিলিয়ে ছবিটা দেখুন। ছবিতে কিন্তু আমরা পরিমাপযোগ্যতা বা স্কেল রাখিনি, নিজে এঁকে দেখান তো একই সাথে পাশাপাশি একটা ১০২ এমবি আর একটা ২৫.৮ জিবি পার্টিশন, মানে একটা অন্যটার ২৫৯ গুণ?

১১।। ফাইলসিস্টেম

পার্টিশন তো হল, এবার? সেই পার্টিশনভূমি তো এখন শূন্য। এবার সেখানে রাজ্য জেলা মহকুমা পাড়া কায়েম করতে হবে, চোর এবং নেতা বানাতে হবে, মস্তান এবং পুলিশ, কার আদেশ কোথা থেকে কোথায় যায়, কোন রুটে, সেই গতিপথগুলো বানাতে হবে, ফাইলসিস্টেম। আর এই যে কোনো কিছু তাদের উপর করে দেওয়ার জন্যে, বারবার শূন্য করে ভরে দেওয়ার জন্যে, নির্বাক জনআধিক্যের ভার, শ্যাডো অফ দি সাইলেন্ট মেজরিটিজ, সেই আডিঙ্কমেমরি বাইটকূল তো আছেই, আসমুদ্রহিমাচল জনগনমনের মত।

প্রত্যেক পার্টিশনেই একটা করে ফাইলসিস্টেম তৈরি করতে হবে। আমরা আগেই বলেছি একটা গ্নু-লিনাক্স ফাইলসিস্টেমের মধ্যে একাধিক ফাইলসিস্টেম ঢুকে আসতে পারে, এসে থাকে। যাদের প্রত্যেকের আবার নিজস্ব কাঠামো, নিজস্ব শিকড়, নিজস্ব ডালপালা থাকে, সবসময়ে এটা আলাদা করে খেয়াল থাকেনা। কারণ, তাদের সবাইকে মিলিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ ফাইলসিস্টেম তৈরি করা হয়, তার এক একটা অংশে এরা বিরাজ করে। যেমন, আমার সিস্টেমে '/mnt' ডিরেক্টরির কথা বলেছি, সেখানে '/mnt/arkive', '/mnt/slackware', '/mnt/windows' এই তিনটে সাবডিরেক্টরি আছে। ছ নম্বর দিনের আমাদের পুরোনো পরিচিত ছবিটাকেই একটু বদলানো চেহারায় আর একবার দেখা যাক, এবার শুধু ইউজার 'dd'-র হোম ডিরেক্টরি '/home/dd'-র ভিতরকার ডিটেইলসটা ছেঁটে দিয়েছি, আর তার জায়গায় '/mnt/slackware' এবং '/mnt/windows' ডিরেক্টরির ডিটেইলসটা একটু এনেছি, জাস্ট এক স্টেপ নিচে অব্দি।
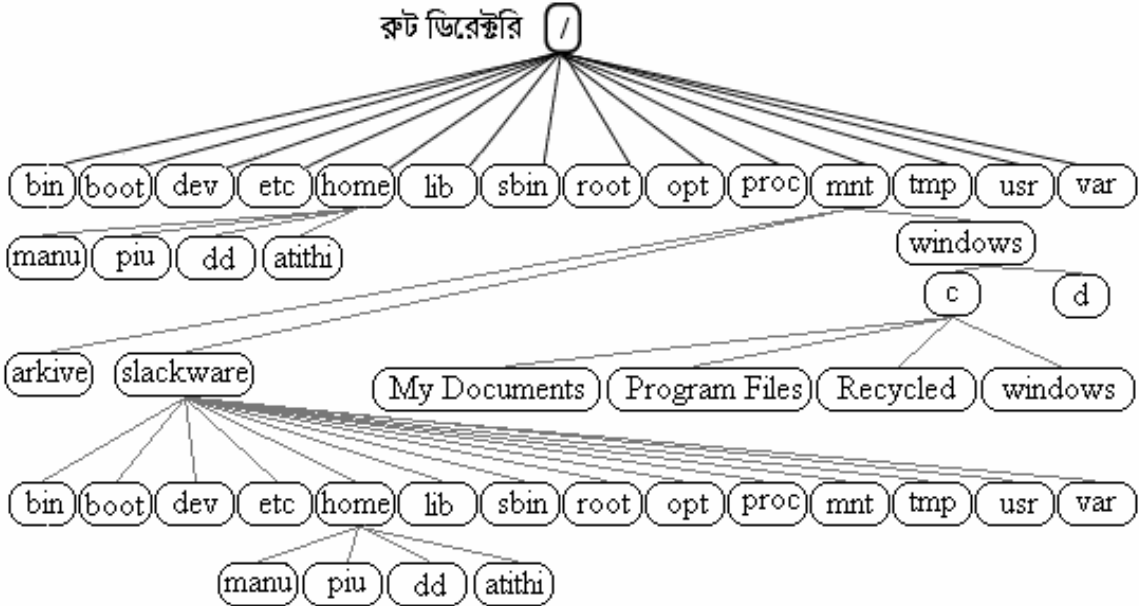
মূল ঐক্যবদ্ধ ফাইলসিস্টেমের '/' এখানে সুজের। এখানে দেখুন, '/mnt/slackware' ডিরেক্টরির ভিতরে সাবডিরেক্টরি কাঠামোটা প্রায় মূল '/' ডিরেক্টরির ভিতরকার কাঠামোর সঙ্গে এক। কিছু তফাত আছে, সুজে আর স্ল্যাকওয়ারের, কিন্তু জটিলতা এড়াতে আমি সেটা বাদ দিয়েছি। স্ল্যাকওয়ারের '/home' ডিরেক্টরির ভিতর আবার সেই একই চারজন ব্যবহারকারীর হোম ডিরেক্টরি। ছ নম্বর দিনের তালিকাটা দেখুন, সুজে সিস্টেমে '/mnt/slackware' ডিরেক্টরিটা মাউন্ট হয় '/dev/hda6' পার্টিশনে। এই '/dev/hda6' পার্টিশনটাই আবার '/' ডিরেক্টরি হয়ে ওঠে যখন স্ল্যাকওয়ার সিস্টেমে বুট করা হয়, এই গোটা ব্যাপারটা আপনি ভালো করে বুঝতে পারবেন মাউন্ট নিয়ে আমাদের আলোচনাটা হয়ে গেলেই। এখন একটু দেখে রাখুন। যারা উইন্ডোজ সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত তারা এখানে '/mnt/windows' ডিরেক্টরির ভিতর সাবডিরেক্টরিগুলোকেও চিনতে পারবেন। '/mnt/windows/c' ডিরেক্টরিতে মাউন্ট হয় '/dev/hda1' পার্টিশনটা, ছ নম্বর দিনের তালিকাটা থেকে মিলিয়ে নিন। '/mnt/windows/d' ডিরেক্টরিতে মাউন্ট হয় '/dev/hda5', আর '/mnt/arkive' ডিরেক্টরিতে মাউন্ট হয় '/dev/hdb5'। একটু বাদেই আমরা এই মাউন্ট প্রসঙ্গে আসছি।

অর্থাৎ, সুজের গোটা গ্নু-লিনাক্স ফাইলসিস্টেমের সংগঠনটার একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। সেই চরিত্রটা এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব, আমরা শুরু করব ওই ব্লক থেকে, আগেই বারবার বলেছি, কম্পিউটারের তথ্যকে বোঝার এবং নাড়াচাড়ার একটা একক। একটা ব্লক মানে ১০২৪ বাইট। একবার হিশেব করে নিন একটু আগের তালিকার থেকে, শুধু খেয়াল রাখবেন যে, এক্সটেন্ডেড পার্টিশনটা এক বা একাধিক লজিকাল পার্টিশনে ভাঙা হয়ে থাকলে, এক্সটেন্ডেড পার্টিশনের মাপটা অন্যগুলোর মধ্যেই রয়েছে, মোট যোগ করে দিলে, এক্সটেন্ডেড পার্টিশনের মাপটা কিন্তু দুবার করে চলে আসে। আর ইউনিট বলে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল একটা সিলিন্ডারের মোট বাইট ধারণ করার সামর্থ্য। এই সামর্থ্যটা দিয়ে মোট হার্ডডিস্কের বাইটসাইজকে ভাগ করে দেখুন, পাবেন চার হাজার আটশো সত্তর —

যেটা হল এই হার্ডডিস্কের সিলিন্ডারের সংখ্যা। হার্ডডিস্কের প্রতিটি পার্টিশনকেই দেখুন, একদিকে দেওয়া হয়েছে সিলিন্ডারের নিরিখে, কত নম্বর সিলিন্ডার থেকে শুরু, কত নম্বর সিলিন্ডারে শেষ। আর প্রতিটি পার্টিশনের তথ্য ধারণ করার সামর্থ্যটা দেওয়া আছে ব্লকের হিশেবে। এই ব্লকের ভিত্তিতেই তৈরি হয় গ্নু-লিনাক্স ফাইল সিস্টেমের সংগঠন। এই ব্লককে আবার ভাগ করা হয় চারটে আলাদা আলাদা রকমে।

এক, বুট ব্লক। বুট ব্লক বলতে বোঝায় যেখানে একটা ছোট বুট প্রোগ্রাম থাকবে এবং পার্টিশন টেবিলটা লেখা থাকবে। দুই, সুপারব্লক। সুপারব্লকে থাকে ফাইলসিস্টেমটার বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য। এখানে একটা ফাঁকা আইনোডের তালিকা রাখা হয়, যেসব আইনোড ব্যবহৃত হয়নি, কারনেল চাইলেই ফাইল লেখার জন্যে ব্যবহার করা হতে পারে। আর রাখা হয় সেইসব ডেটা বা তথ্য ব্লকের তালিকা যারা ফাঁকা আছে, যেখানে কারনেল চাইলেই ফাইল বানাতে পারে, তথ্য লিখতে পারে। তিন, আইনোড ব্লক। আইনোড ব্লকের এলাকায় থাকে ফাইলসিস্টেমের প্রতিটি ফাইলের জন্যে একটা তালিকা বা টেবিল। সেখানে ফাইলের এবং ডিরেক্টরির প্রতিটি তথ্য লেখা থাকে, শুধু ফাইল বা ডিরেক্টরির নামটা বাদ দিয়ে। চার, ডেটা ব্লক। ডেটা বা তথ্য ব্লকে থাকে যাবতীয় ফাইল। সে ফাইল অপারেটিং সিস্টেমের বানানোই হোক, বা কোনো প্রোগ্রামের, বা কোনো ইউজারের। সে ফাইল রেগুলার ডেটা ফাইলই হোক, বা প্রোগ্রাম ফাইল। সমস্ত ধরনের ফাইলেরই বাসস্থান এই ডেটা ব্লক। এখানে ছবিতে আমরা আইনোড-ব্লক আর ডেটা-ব্লককে

ভেঙে দেখিয়েছি এটা বোঝাতে যে এরা অনির্দিষ্ট দৈর্ঘের হতে পারে, এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করতে পারি যে বুট-ব্লক বা সুপার-ব্লকের চেয়ে পরিমাণে এরা অনেক বেশি হবে।

১১.১।। বুট ব্লক এবং সুপার-ব্লক

একটা পার্টিশনের ফাইলসিস্টেমের একদম গোড়াতেই থাকে বুট-ব্লক। এর পরেই আসে সুপার-ব্লক। পাঁচ নম্বর দিনে বুট প্রসেসের আলোচনায়, এবং পরেও আমরা যে এমবিআর বা মাস্টার-বুট-রেকর্ডের কথা এনেছি, এই বুট ব্লকই তার বাসস্থান। বুট ব্লকে লেখা থাকে একটা পার্টিশন টেবিল, এবং বুটিং প্রোগ্রামের হালহদিশ। সেই বিষয়গুলো তো মোটামুটি আমাদের পরিচিত, বুট ইনিট কারনেলের সূত্রে। ইচ্ছে হলে একবার পাঁচ নম্বর দিনের আলোচনাটা একটু উল্টে আসতে পারেন। একটা সিস্টেম যখন বুট করে, সিস্টেমের বায়োস রম চিপে লেখা আদেশ মোতাবেক বায়োস প্রথমেই জরিপ করে নেয় প্রথম হার্ডডিস্কের অবস্থাটা, এবং বুট-ব্লকে লেখা গোটাটা সিস্টেমের মেমরিতে তুলে নেয়। তারপর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয় বুটস্ট্র্যাপিং প্রোগ্রামের হাতে, আমরা যেটা লিলো দিয়ে দেখিয়েছি, এছাড়া গ্রাব হয়, অন্য থার্ডপার্টি সফটওয়ারও হয়। লিলো বা অন্য সেই বুটস্ট্র্যাপিং প্রোগ্রাম এবার কারনেল লোড করা শুরু করে, মনে করার চেষ্টা করুন, '/boot' ডিরেক্টরি থেকে '/boot/vmlinuz'। মনে করতে পারছেন, যার কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন আপনি ক্যাট করে। কাজে যতই দড় হোক, গলা হিশেবে অত্যন্ত থার্ড ক্লাস, না-বলে উপায় নেই। একটা কথা — এই বুটলোডারটা থাকে কিন্তু রুট ফাইল সিস্টেমের গোড়ায়। অন্য ফাইলসিস্টেমগুলোর বেলায় এই বুট-ব্লকটা থাকে শূন্য। যেমন, আমাদের এই সিস্টেমে এমবিআর লেখা হয়েছে প্রথম হার্ডডিস্কের প্রথম পার্টিশনের গোড়ায়, আমরা এখন জানি, তার নাম, '/dev/hda1', অন্য পার্টিশন গুলোর বুট-ব্লক আছে শূন্য। এই কথাটা আমরা পাঁচ নম্বর দিনের আলোচনায় বলে আসতে পারিনি। এর মধ্যেই আমরা একটা গ্নু-লিনাক্স সিস্টেমকে অনেকটাই বুঝতে পারছি, দেখেছেন?

বুট-ব্লকের পরে এবং আইনোড ব্লকের আগে, একটা পার্টিশনের একটা ফাইলসিস্টেমে আসে সুপারব্লক। গ্নু-লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের পার্টিশন পিছু হিশেব-নিকেশের খাতা বলতে পারেন। পার্টিশনটার তথ্যধারণের সামর্থ্য কতটা, তার কতটা ব্যবহৃত হয়েছে, কতটা জায়গা এখনো ব্যবহারযোগ্য আছে, কতগুলো আইনোড-ব্লক এবং ডেটা-ব্লক আছে যাতে এখনো ফাইল বানানো যায় — এই সমস্ত লিখে রাখার খাতা হল সুপারব্লক। এখানে যদি লেখায় ভুল হয় গোটা অপারেটিং সিস্টেমটাই ভুলভাল চলবে, মানে চলবেই না। যে যে বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ থাকে সুপারব্লকে তার মধ্যে আছে — এক, এই পার্টিশনের ফাইলসিস্টেমের সাইজ। দুই, ফাইলসিস্টেমে মোট লজিকাল ব্লক কতটা আছে। এই লজিকাল ব্লকের ব্যাপারটা, আগেও এসেছে, আমরা এর পরেই আইনোড এবং ডেটা-ব্লকের আলোচনায় বুঝতে

পারব। তিন, শেষ কবে ফাইলটা বদলানো বা আপডেট করা হয়েছিল। চার, এই পার্টিশনে মোট কতগুলো ডেটা-ব্লক এখনো ফাঁকা আছে, এবং এখুনি তথ্য লেখা যায় এমন ডেটা-ব্লকের একটা আংশিক তালিকা। পাঁচ, এই পার্টিশনে মোট কতগুলো আইনোড এখনো ফাঁকা আছে, এবং এখুনি ব্যবহার করা যায় এমন আইনোড-ব্লকের একটা আংশিক তালিকা। ছয়, এই পার্টিশনের ফাইল সিস্টেমটা কী অবস্থায় আছে সেই সংক্রান্ত তথ্য, মানে সব ঠিকঠাক আছে, না কিছু জায়গা ঘেঁটে আছে।

একটা পার্টিশনের একটা ফাইলসিস্টেমকে মোট ঐক্যবদ্ধ ফাইলসিস্টেমের আভ্যন্তরীন করার সময় কারনেল এই সুপারব্লকের তথ্যটাকে সিস্টেমের মেমরিতে তুলে নেয়। এবং যখনি কোনো নতুন আইনোড-ব্লক ব্যবহার করা হয়, বা কোনো ব্যবহৃত আইনোড ফাঁকা হয়, সেই আয়ব্যয়ের হিশেবটা সঙ্গে সঙ্গে তুলে দেওয়া হয় এই মেমরিতে তুলে নেওয়া সুপারব্লকের অ্যাকাউন্টস-এ। ঠিক ডেটা-ব্লকের বেলাতেও তাই। নতুন কোনো ডেটা-ব্লক যেই লেখা হয়, বা পুরোনো কোনো ডেটা-ব্লক ফাঁকা হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকেও কারনেল লিখে ফেলে মেমরিতে তোলা সুপারব্লকের কপিতে। মাঝে মাঝে, কিছু সময় অন্তর অন্তর, কারনেল তার মেমরিতে তুলে রাখা সুপারব্লকের প্রতিলিপির সঙ্গে পার্টিশনের সুপারব্লককে মিলিয়ে নেয়, মেমরিতে সুপারব্লকের সক্রিয় প্রতিলিপিটায় নতুন নতুন যা হিশেবে যোগ হয়েছে সেটাকে লিখে ফেলা হয় পার্টিশনের ফাইলসিস্টেমের সুপারব্লকে। এর নাম সিংক করা (sync) ...*খেজুরগাছে* ... । ঠিক সিংক করার আগের মুহূর্তটায় ভাবুন, মূল পার্টিশনের সুপারব্লকটা কিন্তু মেমরিতে সুপারব্লকের কপির চেয়ে পুরোনো। কিন্তু মেমরির সুপারব্লকটা সবসময়ই নতুন। সিস্টেমে শেষবার এই সিংক করাটা ঘটে যখন শাটডাউন ঘটে, মেমরির জ্যান্ত সুপারব্লকটাকে পার্টিশনের সুপারব্লকে লিখে কারনেল বেরিয়ে আসে। আপনার বাড়ির লোকও শান্তি পায়, যাক, আজকের মত মেশিন অফ হয়েছে। সুপারব্লকে যদি কোনো গোলযোগ থাকে, সিস্টেম তাহলে বুট করতে পারেনা, সেইজন্যে গ্নু-লিনাক্সে ডিস্কের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক সুপারব্লক লেখা থাকে। যদি একটা সুপারব্লক ঘেঁটেও যায়, সিস্টেমকে আদেশ দেওয়া যায় অন্য সুপারব্লক ব্যবহার করার। গ্নু-লিনাক্সের পূর্বপুরুষ ইউনিক্সে এই বন্দোবস্ত ছিলনা।

১১.২।। আইনোড-ব্লক

সুপারব্লকের পরেই আসে আইনোড-ব্লক। একটা পার্টিশনের ফাইলসিস্টেমের প্রতিটি ফাইলের জন্যে একটা করে আইনোড রাখা থাকে এই আইনোড-ব্লক এলাকায়। এই আইনোড-ব্লক এলাকাটা কোনো ব্যবহারকারীর ঢোকার জন্যে নয়, শুধু কারনেলের জন্যে সংরক্ষিত। আইনোড-ব্লক এলাকায় ফাইলসিস্টেমের যাবতীয় ফাইলের আইনোডগুলো থাকে পরপর, পরস্পর-সন্নিহিত বা কন্টিগুয়াস রকমে। প্রত্যেকটা ফাইলের এই আইনোডে সেই ফাইল সম্পর্কে এই চরাচরে যা যা জানার থাকতে পারে তার মোটামুটি সবই লেখা থাকে। শুধু একটা জিনিষই থাকেনা এই আইনোডে, সেটা হল ফাইলের নাম। আর, ব্যবহারকারীদের প্রতি গ্নু-লিনাক্সের অপরিসীম যত্ন থেকে আরো দু-একটা জিনিষ ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়, যেমন আপনি কোনো বেআইনি কাজের উদ্দেশ্যে ফাইলটা লিখছেন কিনা সেটা অনুল্লিখিত থাকে, গ্নু-লিনাক্স সিস্টেম খুব নিরাপদ — আগেই বলেছি না।

প্রতিটি ফাইলের এই আইনোড দৈর্ঘে একশো আঠাশ বাইটের একটা তালিকা। এর মধ্যে যা লেখা থাকে সেগুলো হল — এক, ফাইলের রকম, মানে, সেটা রেগুলার ফাইল না ডিরেক্টরি ফাইল না ডিভাইস ফাইল ইত্যাদি। দুই, কটা লিংক আছে ফাইলটার — মনে করতে পারছেন তো '`ls -al`' মেরে পাওয়া দীর্ঘ তালিকার থেকে — পরপর এখন মনে করে যান। তিন, ইউজারের ব্যক্তিগত পরিচিতির সংখ্যা বা ইউআইডি (UID)। চার, ইউজারের গ্রুপের পরিচিতিবাচক সংখ্যা বা জিইউআইডি (GUID)। পাঁচ, ফাইলের বিভিন্ন ধরনের অনুমতির ওই তিন তিরিখ্খে নটা রকম। ছয়, ফাইলে ধৃত মোট বাইটের সংখ্যা। সাত, ফাইলে ধৃত তথ্য শেষ কত তারিখ কোন সময়ে বদলানো হয়েছিল। আট, শেষ কত তারিখ কোন সময়ে ফাইলটা খোলা হয়েছিল। নয়, শেষ কত তারিখ কোন সময়ে আইনোডটা বদলানো হয়েছিল। দশ, ফাইলের পনেরোটা পয়েন্টারের একটা তালিকা। এই পয়েন্টারগুলো ফাইলের কতকগুলো চিহ্নক, ফাইলটায় যারা পৌঁছে দেয়, এদের নিয়ে আলোচনা আসার কোনো সম্ভাবনা নেই আমাদের এই জিএলটি ইশকুল পাঠমালায়, যদি না অনেকটা অব্দি আমরা সি এবং গ্নু-লিনাক্স কারনেলের সিস্টেম কল নিয়ে আলোচনায় আসি, যার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, এটা আট নম্বর দিন চলছে, শূন্য থেকে সাত। গোটাটা দশটা আলোচনায় শেষ করার প্ল্যান আছে। এর পরে আপনি নিজেই এগোতে পারবেন, যদি চান।

অক্টোবরের শেষ থেকে সেই বোকার মত লিখে যাচ্ছি। দু মাসের উপর হয়ে গেল। আজ তিরিশে ডিসেম্বর, এই প্রচন্ড ঠান্ডা, কাল ছবি দিয়েছিল, একটা গাবদু লালগাল বাচ্চা বরফের উপর দিয়ে হাঁটছে দার্জিলিঙে। সেটা দেখেও শীত করছিল। এই যে লিখছি, এই সকাল দশটাতেও আঙুলে যন্ত্রনা করছে, কিবোর্ড থেকে আঙুল সরে যাচ্ছে, টাইপের স্পিড কমে গেছে অনেক। মাঝে মাঝেই গরম চায়ের কাপে আঙুল ঘষে স্বাভাবিক করতে হচ্ছে। এই ভারখয়ানক্সে বসে লেখার প্রোজেক্টে গতকাল আমার কোটা ছিল সারাদিনে পৌনে চার লিটার চা, এবং গোটা পঁচিশেক সিগারেট। এদিকে পা-ভাঙার ছুটিটা নাকি উইদাউট পে হচ্ছেই, লেখার জন্যে আমার এত কামাই হয়। বইমেলা অপরের লেখা দিতে হবে শনিবার, আর এতো পারা যায়না, তার উপরে পয়েন্টার। ওসব নিজে পড়ুন। দরকার হলে জিএলটির সিডি নিয়ে যান, কত পড়বেন পড়ুন, পড়ে যান, আপনারা অনেকেই যে স্পিডে পড়েন, দু-এক দশকে শেষ হবার সম্ভাবনা নেই।

সিস্টেম আইনোডকে চেনে বোঝে ব্যবহার করে আইনোড নম্বর দিয়ে। এই আইনোড নম্বরটা একটা ফাইলসিস্টেমের প্রতিটি ফাইলের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র। এই নম্বরটা আসলে আইনোড-ব্লকের সমগ্রে ওই বিশেষ আইনোডটার অবস্থানের সূচক বা ইন্ডেক্স। আইনোড কথাটা যেখান থেকে এসেছে — ইন্ডেক্স নোড। তাই এই নম্বরটা থেকে নিছক যোগ বিয়োগ করে একটা আইনোডকে পেয়ে যায় সিস্টেম। আইনোড নম্বর কী ভাবে পেতে হয়, মনে আছে, '`ls`'-এর সঙ্গে '`-i`' অপশান হিশেবে দিয়ে। আপনি এখন সিস্টেমে নিজে ঘোরাফেরা করার জন্যে যথেষ্ট জানেন, সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকুন, আর যেখানেই কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না, সিস্টেম ডকুমেন্টেশন পড়ুন। তাতেও অনেকটাই বুঝতে পারবেন না, এই একটা ফাঁক, ওই একটা অস্পষ্টতা, কিছুটা আন্দাজ, এইরকম। তারপর একসময় দেখবেন, হঠাৎ করে গ্নু-লিনাক্স সিস্টেম তার আভ্যন্তরীন প্রক্রিয়া নিয়ে আপনার সামনে হাজির হতে শুরু করেছে। আমি এই গোটা পাঠমালাটায় যে চেষ্টাটা করছি। এই সিস্টেম বহু মানুষের বহু চেষ্টায় একটু একটু করে তৈরি হয়েছে, যা যা বানিয়েছে তারা তার গোটাটার পিছনে একটা জ্যান্ত চিন্তাপ্রক্রিয়া ছিল, সিস্টেমকে বোঝা মানে বানিয়েছে যারা তাদের চিন্তার ধরনটাকে বোঝা। আমি চাইছি আমি যেভাবে সেই প্রক্রিয়াটাকে বোঝার চেষ্টা করেছি তার কিছু প্রম্পট, কিছু কিউ, কিছু সূত্র আপনাদের সামনে ধরে নিতে — যাতে আপনারা পিছনের জ্যান্ত প্রক্রিয়াটাকে চিনতে শুরু করতে পারেন। আগেই তো বলেছি, এটা গ্নু-লিনাক্সের টেক্সট নয়, গ্নু-লিনাক্স ভাবা অভ্যাস করার প্র্যাকটিশ। যুক্তি-তক্কো-গপ্পোর পরও আজ কতগুলো বছর হয়ে গেল, এখনো ভাবা প্র্যাকটিস হলনা আমাদের। তখন দেশভাগের ব্যথা ছিল, এখন তো আর দেশভাগও হয়না, গোটা দেশটাই বিদেশ হয়ে যায় চোখের সামনে।

এখানে একটা জিনিষ খেয়াল করুন, আইনোডে কিন্তু ফাইলের নামও থাকেনা আবার আইনোডের নম্বরও থাকেনা। এই দুটোই রাখা থাকে ডিরেক্টরি ফাইলে। মনে আছে? যে ফাইল কেউই দেখতে পায়না, ডিরেক্টরির মধ্যে কী আছে সেটুকু অব্দিই দেখতে পায়। ফাইল পিছু ওই পনেরোটা পয়েন্টার ছাড়া আর একটা ফাইল সম্পর্কে আর সবকিছুই জানতে পারা যায় 'ls' কমান্ডের সঙ্গে বিভিন্ন অপশানে। নিজে খুঁজে দেখুন। এই 'ls' কমান্ডটা আমরা যখন চালাচ্ছি সে আসলে ওই ডিরেক্টরি ফাইল পড়েই আমাদের সামনে খুঁটিনাটিগুলো ফুটিয়ে তুলছে, সিস্টেম তো পড়তেই পারে ডিরেক্টরি ফাইল, আগেই বলেছি। যখনই আমরা একটা ফাইল খুলি, ঠিক ওই সুপার-ব্লকে যেমন, সিস্টেম হার্ডডিস্ক থেকে এর আইনোডটাকে তুলে নেয় মেমরিতে রাখা আইনোড টেবিলে। কারনেল গোটা সময়টাই কাজ করে মেমরিতে রাখা ওই আইনোডের কপি বা প্রতিলিপি নিয়ে। এই প্রতিলিপিটাকে ডাকা হয় 'আইনোড বাফার' বলে। বাফার নিয়ে আমাদের আলোচনা মনে করুন, এই আইনোড কপিটাও এই মুহূর্তে একটা বাফার। যাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর মিলিয়ে নেওয়া হয় ডিস্কে থাকা মূল আইনোডের সঙ্গে এবং নতুন গজিয়ে ওঠা পার্থক্যটুকু লিখে ফেলা হয় মূল আইনোডে। আবার সেই 'সিংক'। এবার ভাবুন, হঠাৎ করে যদি কারেন্ট অফ করে দেওয়া হয়, সিস্টেমের কাছে গোটাটা তো গোলমেলে হয়ে যাবে, তার মেমরির কপি আইনোড আর মূল আইনোডের মধ্যে একটা ফারাক রয়ে যেতে পারে। এই রকম সব কেরোসিন পরিস্থিতিতে ফাইলসিস্টেম চেক করার একটা ব্যবস্থা থাকে, সিস্টেম নিজেই সেটা করে নেয়, আলাদা করেও করা যায়। কমান্ডটা হল ফাইলসিস্টেম-চেক 'fsck'। প্রত্যেক আলাদা আলাদা ধরনের ফাইলসিস্টেমের জন্যে এর আলাদা আলাদা প্যাকেজ কাজ করে, 'fsck.ext2', 'fsck.reiserfs', 'fsck.vfat' ইত্যাদি। ...*খেজুরগাছে*..। শুধু একটা জিনিষ ভয়ানকভাবে মনে করিয়ে দিই — একটা পার্টিশনে মাউন্ট করা অবস্থায় কদাচ তাতে 'fsck' চালাতে নেই, কদাচ নয়, গোটা হার্ডডিস্কটাই ভোগে চলে যেতে পারে। এখনো আপনি মাউন্ট আর

মাউন্টের কনফিগারেশন ফাইল '/etc/fstab' জানেন না, তাই ম্যান বা ইনফো বা হাউটু পড়ে জানুন, কিন্তু সিস্টেম ঠিকমত বুঝে ওঠার আগে 'fsck' প্রয়োগ করতে যাবেন না, কিছুতেই না। আমাদের জিএলটির দেবাশিসের হার্ডডিস্কে আস্ত আস্ত পার্টিশন ব্যাড-সেক্টর বলে ঘোষিত হয়ে গেছিল।

১১.৩।। ডেটা-ব্লক

আমরা এর আগে যখন পার্টিশন সিলিন্ডার ট্র্যাক সেক্টর এলবিএ এইসবের আলোচনার সূত্রে 'লজিকাল-ব্লক' কথাটা উল্লেখ করেছি, তখন তার সংজ্ঞাটা আমরা জানতাম না, জানা সম্ভবও ছিলনা। এখন সেটা আমরা বুঝব। লজিকাল-ব্লক বা যৌক্তিক ব্লক বলে একটা ব্লককে আলাদা করা হয় ব্লকের ভৌত ধারণা বা ফিজিকাল-ব্লক থেকে। সচরাচর কোনো সিস্টেমে হার্ডডিস্ক কন্ট্রোলার ফাইল পড়া বা লেখার সময় তথ্য নাড়াচাড়া করে পাঁচশোবারো বাইটের এক একটা এককে। আইও ডিভাইস কন্ট্রোলার ব্যাপারটা, যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, মনে পড়িয়ে নিন দুই নম্বর দিন থেকে। এই পাঁচশো বারো বাইটের প্যাকেটকে সচরাচর ডাকা হয় ফিজিকাল ব্লক বলে। কিন্তু কারনেল তার তথ্য লেখা বা পড়ার কাজে এই একক ব্যবহার করেনা। সেই ব্লককে ডাকা হয় লজিকাল বা যৌক্তিক ব্লক বলে। আমাদের সিস্টেমের কাজের মান অনেকটাই নির্ভর করে এই লজিকাল-ব্লকের আয়তনের উপর, কতটা দ্রুত বা শ্লথভাবে গোটা কাজটা সামলাবে সিস্টেম। এই ব্লক সাইজ বাড়ানো বা কমানোর অন্য একটা সমস্যার কথা আমরা উল্লেখ করে এসেছি একটু আগেই, পার্টিশনের আলোচনায়। মনে করতে পারছেন? এখুনি সেটা আবার আসবে।

আমরা আগেই বলেছি, দুই নম্বর দিনে, পরেও এসেছে, আমাদের ক্যারেকটার ডিভাইসগুলো, যেমন কনসোল বা প্রিন্টার, এরা তথ্য নাড়াচাড়া করে চিহ্ন বাই চিহ্ন, মানে ক্যারেকটারের এককে। কিন্তু সিস্টেম হার্ডডিস্কের মত ব্লক ডিভাইসগুলোর সঙ্গে তথ্য নাড়াচাড়া করে খাবলায়। এক খাবলা, আর এক খাবলা, এইরকম। এই খাবলাগুলোই হল ব্লক। এই লজিকাল ব্লক সাইজ সিস্টেম থেকে সিস্টেমে বদলায়। ১০২৪ বাইট থেকে ৮১৯২ বাইট বা হয়তো তারও বেশি। আমরা আগেই বলেছি, গ্নু-লিনাক্সে লজিকাল-ব্লক হল ১০২৪ বাইট। একটু আগে দেওয়া ১০.৩ নম্বর সেকশনে 'fdisk -l' কমান্ডের থেকে পাওয়া তালিকার সঙ্গে এর ঠিক পরেই দেওয়া ছবিটার পার্টিশন সাইজগুলো মেলান — প্রত্যেকটার ব্লক সংখ্যাকে ১০২৪ দিয়ে গুণ করুন, এতে আপনি মোট বাইট সাইজ পেলেন পার্টিশনটার, একে ১০২৪ দিয়ে ভাগ করলে কেবি, তাকে ১০২৪ দিয়ে ভাগ করলে এমবি, তাকে ১০২৪ দিয়ে ভাগ করলে জিবি। প্রত্যেকটা পার্টিশনকেই মেলান, মিলছে? এবার ভাবুন, একবার একটা লেখা বা পড়ার কাজে একটা ব্লক ব্যবহার করা মানে, আপনি হয়ত পাঁচ বাইট মাত্র তথ্য লিখলেন, তার জন্যে খরচ হয়ে গেল একটা গোটা ব্লক মানে ১০২৪ বাইট। এই দুর্মূল্যের বাজারে এক হাজার উনিশ পিস বাইট সিম্পলি নেই হয়ে গেল। কিন্তু আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে, তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে। একটা সুসংগঠিত সিস্টেম, কোথাও কোনো ঘাপলা নেই, নিট কাজ করে যাচ্ছে — সে যে কী অপার শান্তি, মুহূর্মুহু হ্যাং নেই, একটা ফাইল বন্ধ করতে গিয়ে স্ক্যানডিস্ক চালিয়ে দেওয়া নেই, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

এই ডেটা-ব্লকরা শুরু হয় আইনোড-ব্লকের পরে। ছবিটা দেখুন। প্রথমে বুট, তারপর সুপার, তারপর আইনোড, তারপর ডেটা। একদম এক নম্বর দিনের সেই আলোচনা মনে করুন, হার্ডডিস্কের প্রতিটা ফাইলের প্রতিটা তথ্যের একটা নিজের ঠিকানা আছে — সেই ঠিকানাটা হল মোট ডেটা-ব্লকের সমগ্রে একটা বিশেষ ডেটা-ব্লকের নিজস্ব অবস্থান সূচক নম্বর থেকে। মানে অমুক পার্টিশনের অমুক নম্বর ডেটা-ব্লক এই ঠিকানা দিয়ে আমরা ব্লকটাকে চিনি। যে ব্লকগুলোয় তথ্য আছে, তথ্য লেখা হয়ে গেছে, তাদের ডাকা হয় ডিরেক্ট ব্লক বলে। মনে হচ্ছেনা, হঠাৎ এর নাম 'ডিরেক্ট' কেন? এর মানে কী? কোন ব্লকগুলো ডিরেক্ট নয়? ঠিক এটার কথাই বলছিলাম। আপনি এখন সিস্টেম যারা বানিয়েছে তাদের চিন্তার গতিটা বোঝার চেষ্টা করছেন। আমি তপন বিশ্বাস বলে একটা ছেলেকে জানতাম, সে সাপ আর ভূতে ভরা অন্ধকার মসজিদ আর মাঠ দিয়ে হাঁটত আর দিকচক্রবাল দূরের ছোট্ট ছোট্ট আলোকিত জানলার চৌখুপি দেখে ভাবত, ওর মধ্যে লোকগুলো কী ভাবে? চেনা মানে তো চিন্তাকে চেনা।

ঠিকানা তো হল, পরপর সংখ্যা দিয়ে ব্লকদের সূচিত করা, কিন্তু, হারগিস একটা ফাইল পাওয়া যায়না, আরো সেই ফাইল যদি তুলে না-রেখে দিয়ে ব্যবহার করা হয়, যাতে পরপর সন্নিহিত বা কন্টিগুয়াস রকমে ব্লকগুচ্ছে তথ্য তোলা থাকে। ধরুন একটা ফাইল বাড়ছে, আপনি বাড়াচ্ছেন, ফাইলটার ঠিক শেষ ব্লকটার পরের ব্লকটা ফাঁকা নেই, তখন কারনেল কী করবে? তার কোনো দোষ নেই, সে গোটা ডিস্ক জুড়ে ছড়ানো ব্লকদের থেকে যেই কোনো ফাঁকা ব্লক

পায় সেখানেই লিখতে থাকে। কিন্তু এই হুডুম-দাডুম ছিটিয়ে থাকা ব্লকে বিশ্বময় ছড়িয়ে যাওয়া আপনার ফাইলকে পড়া বা লেখাটা ক্রমশই কারনেলের কাছে আরো আরো সময়সাধ্য হয়ে ওঠে, রিড-রাইট মানে লেখা-পড়ার গতি কমে যায়। এরই নাম ডিস্ক ফ্র্যাগমেন্টেশন। আবার দেখুন, এই ফ্র্যাগমেন্টেশন আছে বলেই ইচ্ছেমত ফাইল বাড়ানো বা কমানো যায়। এবার আপনি হয়ত প্রবল আবেগে আপনার কবিতার আরো একটা লাইন ভাবলেন, সিস্টেম আপনাকে জানালো, খবর — পরস্পরসন্নিহিতব্লকাভাবের অনিবার্য কারণবশত, আজ কাব্যলেখা বন্ধ আছে।
তার মানে, সবসময়ই এই হিশেবটা রেখে চলতে হবে, কোন কোন ব্লক ডিরেক্ট ব্লক। তাদের ঠিকানাগুলো তুলে রাখে আইনোড। কিন্তু তাদের সবার ঠিকানা আইনোড তুলে রাখতে পারেনা, মাত্র বারোটা অব্দি পারে — সেই স্থানাভাব। এবং এইজন্যে থাকে কিছু ইনডিরেক্ট ব্লক। এদের নিজেদের কোনো তথ্য থাকেনা। শুধু থাকে সেইসব ডিরেক্ট ব্লকের ঠিকানা যাদের আর আইনোডে রাখা যায়নি, মানে আইনোডের বারোটার পর তেরো নম্বর ব্লক থেকে।

> দাঁড়ান একটা মজার কথা বলে নিই। ঠিক এর আগের লাইনে 'বারোটার' শব্দটা ছিল এই জিএলটি ইশকুল পাঠমালা সিরিজের একলাখতম শব্দ। এটা কি বিধির বিধান? এক লাখ শব্দে আপনাদের গ্নু-লিনাক্স শেখার বারোটা বাজিয়ে দিলাম?

আইনোডেই লেখা থাকে এই ইনডিরেক্ট ব্লকদের ঠিকানা। এবার আপনি বুঝতে পেরেছেন 'ডিরেক্ট' শব্দটার মানে কী?

এই সেকশনটা এখানেই শেষ করা যাক, ঘড়িতেও সকাল বারোটা আঠাশ বাজে, লাখশব্দ হয়েছে কেবল, পরের দিনই করা যাবে সেই গ্নু-লিনাক্স ফাইলসিস্টেম হায়েরার্কি। সেটা প্রায় সাদা-চামড়া মার্কিনীদের গুলিতে মৃত্যুমান শী-এনদের স্বপ্নের কানাডার মত না হয়ে যায়, শেষ ডিসেম্বরের বরফ জমা পাউডার নদী পেরিয়ে যেখানে তারা পৌঁছতে চেয়েছিল, কোনোদিনই পারেনি, হোক রেড ইন্ডিয়ান, এক একটা মানুষ আর কত গুলি নিতে পারে, এক একটা উপজাতি, এক একটা সভ্যতা? দুদিন বাদেই নববর্ষ, এখন তো কলকাতাতেও মার্কিন নববর্ষ হয়, পৃথিবী জুড়ে একটাই নববর্ষ, আমেরিকার নববর্ষ। কোনো এলিয়েন আক্রমন আসতে হয়নি, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সিনেমার মত, এমনিতেই আমেরিকার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে গোটা পৃথিবীর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে করে দেওয়ার বিল পুলম্যানের সেই স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে। কলকাতাতেও হয় মার্কিন নববর্ষ। মার্কিন নববর্ষ মানেই গোটা গোটা জাতির সভ্যতার ইতিহাসের অবশেষহীন অবলোপের সেলিব্রেশন। জাগো, কে কোথায় আছো, জাগো, তিন নম্বর বিশ্বের শুয়োরের কুকুরের এবং ছাগলের বাচ্চারা, মার্কিন নববর্ষের লেফটওভার বিতরণ হবে, জাগো, জেগে থাকো। পরের সেকশনের লেখাটাও ধরা যাবে নতুন বছরে আপনারা জেগে এবং চেগে যাওয়ার পরেই।

সংকলন ও রচনা : মধ্যমগ্রাম জিএলটি-র (glt-mad@ilug-cal.org) তরফে : ত্রিদিব সেনগুপ্ত